১৪ এপ্রিল ২০১৩
www.mistimukh.com
শুভ নববর্ষ ১৪২০

পত্রিকাটি ধুলো খেলায় প্রকাশের জন্য

হার্ড কপি এবং স্ক্যান করে দিয়েছেন শুভজিত কুণ্ড

এডিট করেছেন সুজিত কুণ্ড

একটি আবেদন

আপনাদের কাছে যদি এরকমই কোনো পুরোনো আকর্ষণীয় পত্রিকা থাকে এবং আপনিও যদি আমাদের মতো এই মহান অভিযানের শরীক হতে চান, অনুগ্রহ করে নিচে দেওয়া ই-মেইল মারফত যোগাযোগ করুন।

e-mail : optifmcvbertron@gmail.com

BRACELET CHUR - B1(19gm) ₹63,423 (APPROX) | KATAI BALA - B2(19gm) ₹63,423 (APPROX) | KANKAN CHUR - B3 (18.5gm) ₹61,754 (APPROX) | CHUR - B4(24gm) ₹80,113 (APPROX) | EXCLUSIVE CHUR - B5(40gm) ₹1,33,522 (APPROX) | CHUR - B6(20gm) ₹66,761(APPROX) | ARAI PACH - B7(20gm) ₹66,761(APPROX)

BRACELET PALA - B8(6.5gm) ₹21,698 (Approx) | NOA- B9(10gm) ₹33,381(APPROX) | ARAI PACH- B10(17gm) ₹56,747 (APPROX) | CHUR- B11(13gm) ₹43,395 (APPROX) | CHUR-B12(11gm) ₹36,719 (APPROX) | CHURI-B13(12gm) ₹40,057 (APPROX)

KANKAN CHUR-B14(21gm) ₹70,099 (APPROX) | BALA-B15(12.5gm) ₹41,725 (APPROX) | BALA-B16(22gm) ₹73,437(APPROX) | BALA-B17(11gm) ₹36,719 (APPROX) | BALA-B18(24gm) ₹80,113 (APPROX) | KATAI CHUR-B19(33gm) ₹1,10,156 (APPROX) | KATAI CHUR-B19(33gm) ₹76,775 (APPROX)

নববর্ষের অফার

১২ই এপ্রিল – ১৩ই মে পর্যন্ত • ১৪ই এপ্রিল, রবিবার সব শোরুম খোলা

• সোনার গয়নার মজুরিতে ১৫% অবধি ছাড় • হীরের গয়নার মজুরিতে ২৫% অবধি ছাড় • গসিপ্ কালেকশনে ১০% ছাড় • গ্রহরত্নে ৫% ছাড়
• ₹৭০,০০০ এর উপর সোনার বা হীরের গয়না কিনলে মুক্তোর ব্যাঙ্গেল ফ্রী • ₹ ৩০,০০০ এর উপর কেনাকাটায় আকর্ষণীয় গিফ্‌ট
• স্বর্ণযোজনা স্পেশাল অফার- ২,০০০ টাকার স্কীমে জয়েন করলেই ফ্রী গিফ্‌ট

Kolkata Showrooms: Moulali Megashop: Ph: 22847811/7812 • Bowbazar (Oldest Shop Below Bowbazar High School): Ph: 22419022/7958' • Bowbazar (New Shop Opposite Bank of India): Ph: 40661000 • Jadavpur Megashop (Near Sulekha Bus Stop): Ph: 033 40664000/4003/4004/4005 • Lake Market Megashop: Ph: 24669407/9408 • Behala Megashop: Ph: 65005292/93 • Howrah Maidan Megashop: Ph: 65003612 • Dalhousie Megashop (Beside Passport Office): Ph: 64534212 • Barasat: Ph: 25844961 • Gariahat: Ph: 24408445/5687 • Kanchrapara: Ph: 25850103 • New Town: Ph: 40622030 • Shyambazar: Ph: 25553740, 25308138. **Eastern India Showrooms:** Arambagh: Ph: 03211256270 • Asansol: Ph: 03412316090 • Barrackpore: Ph: 32567155/65480838 • Burdwan: Ph: 03422568400 • Bolpur: Ph: 03463252354 • Bankura: Ph: 03242240122 • Berhampore: Ph: 03482258437 • Chinsurah: Ph: 26811944 • Coochbehar: Ph: 03582229545 • Dankuni: Ph. : 03212 2696669 • Durgapur (Benachity): Ph: 03432584506 • Durgapur (City Centre): Ph: 03433209224/2542526 • Dhanbad: Ph: 03262300374/75 • Jalpaiguri: Ph: 03561222286 • Katwa: Ph: 03453255581 • Khardah: Ph: 25235272 • Kolaghat: Ph: 03228256140 • Krishnanagar(Patra Bazar): Ph: 03472223325 • Malda: Ph: 03512253253 • Raigunj (Thana Road Ukilpara): Ph: 03523242323 • Rampurhat: Ph: 03461255752 • Ranigunj (N.S.C. Bose Road): Ph: 03412442700 • Rupnarayanpur: Ph: 03412530120 • Serampore:Ph:26628497 • Siliguri: Ph: 03532520421 • Suri: Ph: 03462250061 • Tamluk: Ph: 03228266251 • Uttarpara: Ph: 26642933 • Bhubaneshwar: Ph: 0674-2744470/80 • Silchar: Ph: 03842221817.
Delhi Showroom : Ph: 011 4241 4500, 4155 5700, 4155 5710.

www.sencogold.co.in • Helpline: 40215000 • For Franchise contact: +91 9874027010

sndesign/sg/13

খবর ৩৬৫ দিন-এর সঙ্গে বিনামূল্যে

১৪ এপ্রিল ২০১৩
বর্ষ ২। সংখ্যা ১০

রবি

প্রচ্ছদ ৪

মিষ্টিমুখ ডট কম

গৌতম ভদ্র,দেবাশিস বন্দ্যোপাধ্যায়, প্রসেনজিৎ দত্ত, নিবেদিতা দে এবং বিশ্বদীপ দে

গল্প ২৬
সুব্রত বন্দ্যোপাধ্যায়

ধারাবাহিক ১ ৩৩
বানভাসি
সুব্রত সেন

ধারাবাহিক ২ ৩৯
বসন্ত উৎসব
ঋতব্রত ভট্টাচার্য

উদাসী বাবার আখড়া ৪৪
ল্যাডলী মুখোপাধ্যায়

বুলবুল ভাজা ৪৭
হরিদাস পাল

আরব্য রজনী ৪৮

প্রচ্ছদের ছবি:
সৌজন্যে চিত্তরঞ্জন মিষ্টান্ন ভাণ্ডার

সম্পাদক **পূষন গুপ্ত** ▮ সহযোগী সম্পাদক **সুব্রত সেন**

রোজভ্যালি পত্রিকা লিমিটেড-এর পক্ষে পূষন গুপ্ত কর্তৃক ২ টেম্পল স্ট্রিট, তৃতীয় তল, কলকাতা - ৭০০ ০৭২ থেকে প্রকাশিত।
সম্পাদকীয় দফতর: সার্কুলার কোর্ট, ষষ্ঠ তল, ৮ আচার্য জগদীশচন্দ্র বসু রোড, কলকাতা ৭০০ ০১৭।

রসেবশে শতবর্ষে
SINCE 1907
Chittaranjan
MISTANNA BHANDAR
www.rasogolla.com

বাঙালির মিষ্টান্ন

রসই জীবনের সব, মনে হয় ভারী উপনৈষদিক বাণী, 'রসো বৈ সঃ।' উদর থেকে হৃদয়ে রসের জগৎ ছড়িয়ে আছে, একটার টানেই তো আরেকটা আছে।

গৌতম ভদ্র

রস, রসিক আর রসগোল্লা—এই ছকেই বাঙালির মিষ্টান্ন সাধনার বিবর্তন চলেছে। রসই জীবনের সব, মনে হয় ভারী উপনৈষদিক বাণী, 'রসো বৈ সঃ।' সাহিত্যের টীকা লিখতে গিয়ে রসের কথা বারবার এসেছে, গুড়, মধু, ও দইয়ের মিশালে জমিয়ে ওঠার উপমায় যে বিভাবের নানা অনুপানে ভাব রসের আস্বাদনে রূপান্তরিত হয়, এই কথা অভিনবগুপ্ত কবে জানিয়েছেন। কবি, কবিরাজ আর দুর্দান্ত পাচক কৃষ্ণদাস চৈতন্য প্রেমভাব বোঝাতে বারবার রসিকের রসনারই উপমা এনেছেন, যেমন 'কৃষ্ণনাম শ্রবণ তপ্ত ইক্ষুরস চর্ব্বণ।' উদর থেকে হৃদয়ে রসের জগৎ ছড়িয়ে আছে, একটার টানেই তো আরেকটা আছে।

বাঙালির নিমাই ও তাঁর পরিকররা খেতে ও খাওয়াতে ভালোবাসতেন, ভক্তির একটা উপচারই ছিল মিষ্টান্ন। তখন চৈতন্য পুরীতে। বাংলা থেকে পরিকররা তাঁকে ভেট করতে যাচ্ছেন, অনেক দূরের পথ, তাই ঝালি ভরে নেওয়া হচ্ছে রসবিবর্জিত অনেক শুকনো মিষ্টি। ষোড়শ শতকে চৈতন্য চরিতামৃতে কৃষ্ণদাস অনুপম বর্ণনা দিয়েছেন। লিস্টিতে কাসুন্দি আর মণ্ডা আছে, আছে হরেক রকমের নাড়ু, চিড়ের, মুড়ির, খইয়ের আর ফুটকলাইয়ের, 'নারিকেল খণ্ড নাড়ু আর নাড়ু গঙ্গাজল।' দক্ষ রসুয়ে কৃষ্ণদাস প্রক্রিয়ার বিবরণও দিয়েছেন, 'কতক চিড়া হুড়ুম করি ঘৃতেতে ভাজিয়া। চিনিপাকে নাড়ু কৈল কর্পূরাদি দিয়ে।' আবার, 'ফুটকলাই চূর্ণ করি ঘৃতে ভাজাইল। চিনিপাকে কর্পূরাদি দিয়া নাড়ু কৈল।' নাড়ুর সঙ্গে আছে ঝালি ভর্তি ক্ষীরের মণ্ডা, 'চিরস্থায়ী ক্ষীরসার মণ্ডাদি বিকার।' এই 'মাসেকের বাসি করা।' নাড়ু আর অমৃত গুটিকা মণ্ডাই চৈতন্য আর তাঁর পরিকল্পনা নিঃশেষ করে আর কিছু আছে কি না জিজ্ঞেস করেছিলেন। শুকনো মিঠাই তো তখন ভক্তিরসে ভেজা। বাসুদেব সার্বভৌম পত্নী মাঠীর মা দুপুরবেলায় চৈতন্যকে 'গৌড়ে উৎকলে যত ভক্ষ্যের প্রকার' খাইয়েছিলেন, সেই তালিকায়

বেনারসী
কলমকারী
ফুলকারী
জারদৌসী
রাজশাহী
বোমকাই

শুভ ১লা বৈশাখ

গাদোয়াল
কাঞ্জীভরম
আসাম সিল্ক
ওয়াল কলাম
তাঁত, পাঞ্জাবী
সিল্ক, শাল

স্থাপিত - ১৮৬২

প্রিয় গোপাল বিষয়ী®

বড়বাজার ঃ

৭০, পণ্ডিত পুরুষোত্তম রায় স্ট্রীট (খেংড়াপট্টী), কোলকাতা–৭,
ফোন ঃ ২২৬৮ ৬৪০২, ২২১৮ ০৩৪৮
২০৮, মহাত্মা গান্ধী রোড, কোলকাতা–৭, ফোন ঃ ২২৬৮ ৬৫০৮

গড়িয়াহাট ঃ

১১৩/১এ, রাসবিহারী এভিনিউ, ট্র্যাঙ্গুলার পার্কের বিপরীতে, কোলকাতা–৭০০ ০২৯,
ফোন ঃ ২৪৬৫ ৮২৪৬

এছাড়া আমাদের আর কোনো শাখা নেই

PRASA-13

যে কোনও বর্ধিষ্ণু কলকাতার গেরস্তবাড়ির ভাঁড়ারে টুকিটাকি জলখাবারের জিনিস থাকবে, শিকে ঝোলা হাঁড়ি হাতড়ালেই এটা সেটা পাওয়া যাবে।

ক্ষীরপুলি আর নারিকেলপুলির সঙ্গে রসেরও ছড়াছড়ি ছিল। 'রসালা মথিত দধি সন্দেশ অপার।' চৈতন্যের হাপুস হুপুস খাওয়া দেখে সার্বভৌম জামাত অমোঘ ফুট কেটেছিল। অমোঘের পরের দিন সকালেই কলেরা হল, চৈতন্যের কৃপায় অসুখ সেরে গেল। কৃষ্ণদাস কবিরাজের তত্ত্ব পরিষ্কার, গোস্বামীতত্ত্বে খাওয়ার প্রকৃত মাহাত্ম্য না বুঝলে চৈতন্যলীলার রস পুরোপুরি আস্বাদন করা যাবে না।

বাড়ির তৈরি করা মিষ্টান্ন আর বাইরের কিনে খাওয়া মিষ্টি। মোদক মিষ্টি তৈরি করে ফেরি করে বেড়াত, মুকুন্দরাম সেই রকমই বলে গেছেন। কালকেতুর গুজরাটনগরে ময়রা পসারি, 'মোদক প্রধান রানা/করে চিনি কারখানা খণ্ড নাড়ু করয়ে নির্মাণ,/পশরা করিয়া শিরে/নগরে নগরে ফিরে/শিশুগণ ধরয়ে জোগান।' বিশ শতকেও ফিরিওয়ালা ময়রা হয়েই তো গাঙ্গুরাম কলকাতায় তাঁর প্রথম ব্যবসার সূত্রপাত করেন, অপুদের গ্রামে চিনিবাস ময়রা তো কালেভদ্রে মিষ্টি ফেরি করতেই আসত।

২

মধ্যযুগে মিষ্টিতে হাত পাকাত বৈষ্ণবরাই, কবি নরহরির লকবই ছিল 'রসুয়ে।' বৈষ্ণবীয় শুকনো মালপোয়া বাইরে থেকে এসে বাংলাতেই রসে ভিজে গিয়েছিল, এই কথা বৈষ্ণব প্রবাদসম্মত। সাধ্যমত চিড়া, দই, মণ্ড দিয়ে মহোৎসব করাও বৈষ্ণবদের রীতি। মহাজন থেকে গরিবগুর্বোরা সেই ভোজনে অংশ নিত। বামুনে ফলারও ছড়িয়ে পড়ে, রাম নারায়ণ তর্করত্নের দেখা উত্তম ফলারের তালিকায় আছে, 'মতিচূর বঁদে খাজা, ছানাবড়া বড় মজা' আর 'খাসা মণ্ডা' আর অধম ফলারে 'মিষ্টির নামগন্ধ নেই', আছে কেবল 'জলো দই, তিত গুড় আর ধেনো খই।' মনে রাখবেন যে বরযাত্রীদের উত্তম ফলার আর প্রতিবেশীদের অধম ফলার খাইয়ে বেচারি গরিব বিধবা প্রফুল্লের মার বিড়ম্বনার শেষ ছিল না, হিংসুটে প্রতিবেশীদের দেওয়া মিথ্যা অপবাদে সে একঘরে হয়েছিল, এই দুর্ভোগের গল্প দিয়ে বঙ্কিমচন্দ্র 'দেবী চৌধুরানী' শুরু করেছিলেন। বাঙালি জীবনে মিষ্টি খাওয়া আর খাওয়ানোর বিড়ম্বনার গল্পের শেষ নেই।

উনিশ শতকে শহর 'কলকাতা' আস্তে আস্তে কমলালয় হয়ে উঠছে, বাঙালির মিষ্টি কালচারেও রদবদল ঘটছে। যে কোনও বর্ধিষ্ণু কলকাতার গেরস্তবাড়ির ভাঁড়ারে টুকিটাকি জলখাবারের জিনিস থাকবে, শিকে ঝোলা হাঁড়ি হাতড়ালেই এটা সেটা পাওয়া যাবে। সেটাই পাকা গিন্নির সংসারপনা, তালিকাও কল্যাণী দত্ত দিয়েছেন, 'জিবে গজা, কুচো গজা, মালপোয়া, মোহনভোগ, রসবড়া, রসকরা, নারকোল ছাবা' ইত্যাদি। কারণ বাড়িতে লোক এলে এক ঘটি জলের সঙ্গে দুটি চারটি ছোট নাড়ু ধরিয়ে দেওয়া গৃহস্থ বাড়ির রেওয়াজ দিল। মুদির দোকানে মুড়কি মিলত, সস্তার কটকটেও পাওয়া যেত। বাতাসা ছিল দুই রকমের, বড় বাতাসা বা ফেনি, ছোট বাতাসা বা ফুল, গুড় বা চিনি দিয়ে দুটোই তৈরি হত। স্কুল থেকে ফিরে সুনীতিকুমার এই সব খেয়েই টিফিন সেরে নিতেন। বাড়ির দৈনন্দিন পুজোয় ওই বাতাসাই নৈবেদ্য, হত, ঠাকুর-ঠাকুরানিরা খেতেন, পিঁপড়েও খেত।

৩

উনিশ শতকের দ্বিতীয় অর্ধ থেকেই কলকাতায় মিষ্টির দোকানের জাঁক শুরু হয়। মহেন্দ্রনাথ দত্ত সেরকমই লিখেছেন। ১৮৭০ সালেও উত্তর কলকাতায় বড় মিষ্টির দোকান বেশি ছিল না। হালুইকররা মিষ্টি করত, এক সাধুবাবার তৈরি করা মিষ্টিও বেশ নাম করেছিল। তখন থেকে হুগলি ও হাওড়া থেকে মোদকরা কলকাতায় আসছেন, জনাই থেকে ভীমনাগ দোকান খুলছেন, দ্বারিক ঘোষ ও গিরিশচন্দ্র

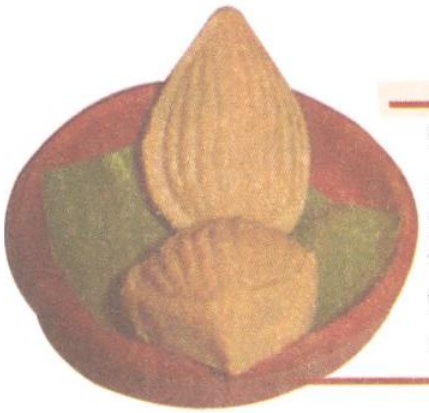

উনিশ শতকের গোড়ায় মুড়কির মোয়াই সার্বজনীন মিষ্টির কাজ করত, মাহেশের মুকুন্দ খোয়ার নাম সারা বাংলায় চালু ছিল। ধনেখালির খইচুর কিছুদিন মুকুন্দ খোয়াকে দাবিয়ে রাখে। চিনির ব্যবহার বাড়লে জনাইতে শুরু হল রসকরা, নারিকেল পাকের সঙ্গে চন্দ্রপুলি, ক্ষীরের সঙ্গে মিশেলে ক্ষীরগুলি। প্রাণকৃষ্ণ দত্ত জানাচ্ছেন যে, উনিশ শতকের দ্বিতীয় ভাগে ছানার ব্যবহার মিষ্টান্নকে 'তৃতীয় স্বর্গে' উন্নীত করল। ঐতিহাসিকরা বলছেন যে, রানাঘাটের হারাধন ময়রা রসে ছেনা ফেলে রসগোল্লা তৈরি করেছিল।

দে (১৮৪৪) আসছেন। রেলের কল্যাণে নানা জায়গার বিশেষ মিষ্টিও কলকাতায় কাজে কর্মে আসছে। যেমন, কৃষ্ণনগরের সরভাজা ও সরপুরিয়া, বর্ধমানের মিহিদানা ও সীতাভোগ, খাগড়াই মুড়কি, জনাইয়ের মনোহরা ও নৈহাটির গুঁফো। উনিশ শতকের প্রথম পর্বে মিষ্টির বড় শরীরী দেখনদারি ছিল। ১২৭১ সালে অভয়চরণ মিত্রের বাড়িতে পুজোর সবচেয়ে ছোট মিষ্টির ওজনই ছিল ১০/১২ সের। তার স্বাদ খাওয়ায় ছিল না, ছিল বাবুয়ানার বাহাদুরিতে। এই রুচিরই পরিবর্তন ঘটছে উনিশ শতকের দ্বিতীয় পর্বে। মিষ্টির আয়তন কমছে, বৈচিত্র বাড়ছে। নিজের বাড়িতে নিমন্ত্রণ করে সব জেলার রকমারি মিষ্টি খাইয়ে হরপ্রসাদ শাস্ত্রী তরুণ সুনীতিকুমারকে তাঁর গবেষণার জন্য সংবর্ধনা দিয়েছিলেন, সেই আপ্যায়নের কথা সুনীতিকুমার আমৃত্যু মনে রেখেছিলেন। দোকানের মিষ্টির তুলনায় বাড়ির মিষ্টি একটু ম্রিয়মান হচ্ছে, তাও বোঝা যায়। উনিশ শতকের মাঝে 'বোধেন্দু বিকাশ' নাটকে ঈশ্বরচন্দ্র গুপ্ত রমণী রূপলাবণ্য ময়রার দোকানে প্রদর্শিত নাটকের সঙ্গে তুলনা করছেন—'আহা, এই নদীতটে, / দোকান জাঁকালো বটে/ একেবারে খুলে গেল, ভুলে গেল মন। বিম্বধর পানতুয়া, বাসিত চন্দন-চুয়া, ভাসিছে হাসির রসে, কিবা সুগঠন।' ঠিক এর পঞ্চাশ-ষাট বছর বাদে আশুতোষ মুখোপাধ্যায়কে রামায়ণ-মহাভারত পড়ে গুরুদাস বন্দ্যোপাধ্যায় তাঁর সাহিত্যবোধকে এই ভাষায় প্রকাশ করেছিলেন, 'কৃত্তিবাসের রামায়ণ হচ্ছে ভীমনাগের সন্দেশ ও কাশীরাম দাসের মহাভারত নবীন দাসের রসগোল্লা।'

৪

একেবারে দোকানের নামে একটি একটি গোত্রের মিষ্টির 'ব্র্যান্ড নেম', উনিশ শতকের শেষ পর্বের দান। স্মৃতি কথায় মহেন্দ্রনাথ দত্ত জানিয়েছেন যে ১৮৭৪-৭৫ সাল নাগাদ তাঁরা জলভরা সন্দেশ ও রসগোল্লা প্রথম চেখে দেখেন। নিরেট জিনিসের ভিতর কী করে জল ঢুকল, তা নিয়ে সেদিনের ছোট ছেলেরা অবাক হয়েছিল। পুরোনো মণ্ডা, আতা সন্দেশের প্রচলনও কমতে শুরু করে মিষ্টির রকমফের বাড়তে থাকে, তাতে সূক্ষ্মতা আনার জন্য অনুশীলন ও পরিশীলনের শেষ থাকে না। উনিশ শতকের গোড়ায় মুড়কির মোয়াই সার্বজনীন মিষ্টির কাজ করত, মাহেশের মুকুন্দ খোয়ার নাম সারা বাংলায় চালু ছিল। ধনেখালির খইচুর কিছুদিন মুকুন্দ খোয়াকে দাবিয়ে রাখে। তখন তো গুড়ের পাকেই মিষ্টি হত। চিনির ব্যবহার বাড়লে জনাইতে শুরু হল রসকরা, নারিকেল পাকের সঙ্গে চন্দ্রপুলি, ক্ষীরের সঙ্গে মিশেলে ক্ষীরগুলি। প্রাণকৃষ্ণ দত্ত জানাচ্ছেন যে, উনিশ শতকের দ্বিতীয় ভাগে ছানার ব্যবহার মিষ্টান্নকে 'তৃতীয় স্বর্গে' উন্নীত করল। ঐতিহাসিকরা বলছেন যে, রানাঘাটের হারাধন ময়রা রসে ছেনা ফেলে রসগোল্লা তৈরি করেছিল। কারও কারও মতে বর্ধমান জেলার ভাতার গ্রামের গোপাল ময়রাও গোপাল গোল্লা বানিয়েছিল, কলকাতার ব্রজ ময়রাও এই মিষ্টির জনকত্বের দাবিদার। এই ঢেলা বা শক্ত রসগোল্লার পরিশীলিত সংস্করণ নরম স্পঞ্জ রসগোল্লা, আবিষ্কারক ভোলা ময়রা পরিবারের জামাই বাগবাজারের নবীন দাস। তাঁর বংশধররা বিংশ শতকের তিরিশের দশকে 'রসমালাই' বানান। একেবারে আধুনিক শহুরে বিজ্ঞাপনও দেখি—'নূতন আবিষ্কার, রসনার শ্রেষ্ঠ রসমালাই, বিজ্ঞানসম্মত যন্ত্রাদি সাহায্যে প্রস্তুত ও সংরক্ষিত, ধুলা ও মাছি আবরক কাঁচের ঘরে রক্ষিত, আসল বাগবাজার রসোগোল্লা ও সন্দেশ, শ্রীকৃষ্ণচন্দ্র দাস।' কৃষ্ণদাস কবিরাজ ও কৃষ্ণচন্দ্র দাস দুইজনের মধ্যে চারশো বছরের ফারাক, বাংলায় মিষ্টির উপস্থাপনার ভাষাটি পাল্টে গেছে, তবে রসনার চাহিদা কমেনি।

৫

বাঙালি মিষ্টির সেরা নাড়িটেপা ডাক্তার বিপ্রদাস মুখোপাধ্যায়। তাঁর লেখা ও ছাপা ১৩০৫ ও ১৩১২ সালে ছাপা, দুই খণ্ডের 'মিষ্টান্ন পাক' তো ওই বিষয়ের অনন্য এনসাইক্লোপিডিয়া। বিপ্রদাস জানাচ্ছেন যে, ছানা ও চিনির মিশেলে সন্দেশের পাক তৈরি করা ও জ্বালের সঙ্গে সঙ্গে তাড়ু চালানো ঠিক শিল্পীর কাজ। ওই কর্মটি না জানলে সব মাটি। বইতে তিনি বারোটি পাক ঠাহর করেছিলেন, আর উনপঞ্চাশ রকমের সন্দেশের নাম দিয়েছিলেন। সন্দেশের ছাঁচ তো নানারকমের। বাজারে জোর প্রতিযোগিতা আছে, ক্রেতাদের রুচির পরিশীলনে ধরতাই দিতে হবে। তাই বিপ্রদাস সাফসুতরো বলছেন, 'ইহা জানা আবশ্যক যে একই পাকের সন্দেশ, ভিন্ন ভিন্ন ছাঁচে ফেলিয়া, ভিন্ন ভিন্ন নামে প্রস্তুত করা হইয়া থাকে। রূপকথার পিঠে এখন পালাপার্বণের খাবার, আসকা পিঠা, গুড় পিঠা গরিবরাই খায়।'

৬

বাঙালি হলেও বিপ্রদাস পুরোপুরি অকৃতজ্ঞ নন। তাঁর রচনায় তিনি উনিশ শতকের মিষ্টি ব্যবসাতে হিন্দুস্তানি হালুইকরদের দান স্বীকার করেছেন। বোঁদে, মতিচুর, নাড়ু, গজা আর জিলিপি যে তাঁদের আমদানি আর ওই মিষ্টি তৈরি করার পরম্পরাতে তাঁরাই শ্রেষ্ঠ এই সত্যটা মানতে তাঁর কুণ্ঠা ছিল না। কলকাতার মেসবাড়ি আর হালুইকরদের দোকানের যোগাযোগের ইতিহাস আজও অলিখিত।

আকারে নয়, বরং উপাদানের উৎকর্ষে, পাকের মিশেলে ও স্বাস্থ্যবিধি রক্ষায় বাঙালি মিষ্টির শ্রেষ্ঠত্ব। পুঁজি না থাকলে বড় দরের মিষ্টির ব্যবসা চালানো সম্ভব নয়, বিপ্রদাসের চিন্তা এইরকম ছিল। এমপ্রেস গজা আর লেডিকেনি কেবল আকারে বড়, আদত গজা, পানতুয়া, বা ছানাবড়ার চেয়ে সুস্বাদু নয়, এই কথাও তিনি মনে করিয়ে দিয়েছিলেন। আজকের ওয়েবসাইট আর মিষ্টির ভাগ্যজোড়া ব্যবসায়ে বিপ্রদাসের পরিমিতিবোধটি দরকার। পরিমিতিবোধই শিল্পের শর্ত, এমনকী রন্ধন শিল্পেরও। একটি কথাকণিকা মনে আসে। নকুড়চন্দ্র দাসের দোকানে কল্যাণী দত্ত গিয়ে বলেছেন যে, 'ভালো সন্দেশ দেবেন তো, রেখে কাল পর্যন্ত খাব।' বুড়ো কর্তা দোকান থেকে নেমে এসে ধমক দিলেন 'কলকাতার কোথায় থাকা হয়? নকুড়ের সন্দেশ বাসি করে রেখে খাবেন, বলছেন!' রসের মর্যাদা তো একমাত্র রসিকই দিতে পারেন, সমালোচনার হকদারও তিনি। ❖

ঋণ স্বীকার: জিৎ চৌধুরী।

করলা তেতো নয়, মিষ্টি

গ্রামগঞ্জের হাটতলায় যে মিষ্টির দোকানটি থাকে তাদের প্রত্যেকেরই কিছু না কিছু বিশেষ 'আইটেম' থাকে। হালুইকর শব্দটি আর সেখানেও ব্যবহার হয় না। অথচ হালুইকররা ছিলেন, এখনও আছেন। 'আর্টিস্ট' কথাটি অবশ্য কখনও তাঁদের ক্ষেত্রে প্রযোজ্য হয়নি।

দেবাশিস বন্দ্যোপাধ্যায়

মিষ্টির দোকানের বেচা-কেনা সেরে ও সাংসারিক খরচ-খরচা মিটিয়ে হাতে যে টাকা থাকত তা দিয়ে যামিনী রায়ের ছবি কেনার উদাহরণ উত্তর কলকাতাতেই আছে। মিষ্টির দোকানের সেই কারিগর তথা মালিকের উত্তরাধিকারীরা সেইসব ছবি অত্যন্ত যত্নের সঙ্গে সাজিয়ে রেখেছেন তাঁদের পুরোনো বাড়ির নানা দেওয়ালে। একই ছানা থেকে নানা ধরনের মিষ্টি তৈরি একটা 'আর্ট' ছাড়া কিছু নয়। যাঁরা মিষ্টি তৈরি করেন তাঁদের 'হালুইকর' বলা হত এক সময়। শব্দটি অপ্রচলিত হতে চলেছে। গ্রামগঞ্জের হাটতলায় যে মিষ্টির দোকানটি থাকে তাদের প্রত্যেকেরই কিছু না কিছু বিশেষ 'আইটেম' থাকে। কিন্তু হালুইকর শব্দটি আর সেখানেও ব্যবহার হয় না। অথচ হালুইকররা ছিলেন এবং এখনও আছেন। 'আর্টিস্ট' কথাটি অবশ্য কখনও তাঁদের ক্ষেত্রে প্রযোজ্য হয়নি। হস্তশিল্পী, বয়ন শিল্পী—এসব শব্দ কখনও সখনও কানে আসে। মিষ্টান্নশিল্পী শুনিনি। অথচ তাঁরা শিল্পী ছড়া আর কী! নিজস্বতা ও বৈশিষ্ট্য তাঁদের কিছু কম নেই। যেমন বর্ধমান-কাটোয়া রেলপথে ভাতার গ্রামের (এখন ছোট শহর) গোপালগোল্লা। এই গ্রামের গোপাল ময়রা তৈরি করতেন স্পঞ্জ ধরনের রসগোল্লা। তিনি তার নাম রেখেছিলেন গোপালগোল্লা। তাঁর নামেই এই মিষ্টি বিক্রি হত, চাহিদাও ছিল প্রচুর। বাংলার অখ্যাত অজ্ঞাত গ্রাম-গঞ্জের যে সমৃদ্ধি, তারই কিছুটা পরিচয় বহন করে এই গোপালগোল্লা।

এরকম আরও অনেক উদাহরণ দেওয়া যেতে পারে। এই মুহূর্তে মনে পড়ছে চন্দননগরের কিংবদন্তি, ঐতিহাসিক ব্যক্তিত্ব সূর্যকুমার মোদকের কথা। ১২৫৩ বঙ্গাব্দে তিনি জন্মগ্রহণ করেন। বাংলার মিষ্টির ইতিহাসে তাঁর অনন্য সৃষ্টি জলভরা তালশাঁস সন্দেশ, ক্ষীরপুলি, আম সন্দেশ, মোতিচুর। তাঁর বিশেষ প্রস্তুত-প্রণালী আজও অবিকৃত রেখে তাঁর এক প্রপৌত্র সূর্যকুমারের প্রতিষ্ঠিত বারাসত, জিটি রোড চন্দননগরের দোকানে সেই ঐতিহ্য বজায় রেখেছেন অত্যন্ত নিষ্ঠার সঙ্গে। প্রতিদিন অন্তত আটষট্টি রকমের মিষ্টি তৈরি হয় এই দোকানে। সূর্যকুমারের নামে তাঁর আত্মীয়দের যেমন একাধিক দোকান আছে চন্দননগরে, তেমন সূর্য মোদক সন্দেশও বেশ প্রচলিত বারাসাত চন্দননগরের দোকানে। চলতি হাওয়ার পন্থী যে তাঁরা হন না, তা নয়। কিন্তু

www.bengalshelter.com

স্বাগত ১৪২০

বেঙ্গল শেল্টার
প্রকৃতি ও প্রযুক্তির মধুর গাইড

নীল দিগন্ত
বারাসাত

দিগন্তের পাশে প্রাণখোলা আবাস

- সুপরিকল্পিত উদ্যান
- জগিং ট্র্যাক
- অন্তরঙ্গ - আড্ডা জোন
- ছোটদের খেলার জায়গা
- প্রয়োজনী - মাংস, ডিম, মাছ ও সবজীর দৈনিক বাজার
- দুগ্ধ কেন্দ্র
- অঙ্গন - ছোটদের অঙ্কন, নৃত্য ও সঙ্গীত শিক্ষা কেন্দ্র
- কচিপাতা (ক্রেশ)
- খবরাখবর (ম্যাগাজিন বুথ)
- আধুনিক সমাজ কক্ষ

নাগালের মধ্যেই বেলঘরিয়া, ব্যারাকপুর, কল্যাণী। নির্মীয়মাণ মেট্রো স্টেশন, অজস্র বাস, রেল, হাতের কাছেই জাতীয় সড়ক চৌত্রিশ, বিদ্যাপীঠ, হাসপাতাল, বাজার, সবমিলিয়ে নাগরিক জীবনের নিশ্চিন্তি। সব আয়ের মানুষের জন্য বাণিজ্য ও বিনোদন প্রাঙ্গণসহ স্বয়ংসম্পূর্ণ নীলদিগন্ত।

নীলদিগন্তের আবাসগুচ্ছ

বাগেশ্রী (উচ্চবিত্ত) ১১৬৯ - ১৩৫১ বর্গফুট (3BHK)
সোহিনী (মধ্যবিত্ত - নিম্ন ও উচ্চ) ৬৬৫ বর্গফুট ও ৮২০ বর্গফুট (2BHK)
হিন্দোল (সাধ্যবিত্ত) ৪৭৫ বর্গফুট (1BHK)

বাগেশ্রী ও সোহিনী (উচ্চ)-এর জন্য আবেদনপত্র নেওয়া হচ্ছে।
পর্য্যাপ্ত আবেদনপত্রসাপেক্ষে লটারির মাধ্যমে ফ্ল্যাট বরাদ্দ করা হবে।
প্রকল্পের অন্তর্গত সাধ্যবিত্ত (LIG) আবাসগুচ্ছ **হিন্দোল** পরে বিজ্ঞাপিত হবে।

বেঙ্গল শেল্টার হাউজিং ডেভেলপমেন্ট লিমিটেড
(পশ্চিমবঙ্গ আবাসন পর্ষদের একটি যৌথ সংস্থা)
সিবি - ৬৩, সেক্টর-১, সল্টলেক, কলকাতা-৭০০০৬৪,
ই-মেল: marketing@bengalshelter.com

সাইট অফিস:
নীলদিগন্ত বারাসত, ২৪ পরগনা (উত্তর)
ফোন: ৬৫২২ ১০৮৬

4004 2372 2358 6428 6522 1086

রবীন্দ্রনাথ ঠাকুর বজরা করে এসে নামতেন চন্দননগরের পাতালবাড়ির ঘাটে। সূর্য মোদকের কাছে মিষ্টির 'অর্ডার' দিতেন। জলভরা, মোতিচুর সন্দেশ, ক্ষীরপুলি সন্দেশ।

সেখানেও তাঁরা নিজস্বতার ছাপ রেখেছেন অভ্রান্তভাবে। যেমন ক্যাডবেরি জলভরা সন্দেশ। এই সন্দেশ সূর্যকুমার নিজে তৈরি করে যাননি। কিন্তু তাঁর প্রতিভার ফল্গুস্রোত যে বহমান, বুঝতে অসুবিধা হয় না। আধুনিকতার ছাড়পত্রও তাঁরা দিয়েছেন অকাতরে। ফ্রায়েড রসগোল্লা ইন মালাই এরকমই এক মিষ্টি। ফ্রায়েড রাইস, ফিশ ফ্রাই,ফ্রায়েড চিলি চিকেন-এর অনুষঙ্গে ফ্রায়েড রসোগোল্লা!

এ এক অদ্বিতীয় প্রকাশ। টু-ইন ওয়ান সন্দেশ, আইসক্রিম সন্দেশও আছে এঁদের দৈনন্দিন মিষ্টান্ন তালিকায়।

১২৯০ বঙ্গাব্দের কথা। তেলেনিপাড়ার জমিদার গৃহিণী এলাকার প্রখ্যাত মিষ্টান্ন ব্যবসায়ী সূর্যকুমার মোদককে ডেকে পাঠিয়েছিলেন। জমিদার-গৃহিণীর আবদার, বাড়িতে নতুন জামাই আসছে, তাকে নতুন ধরনের মিষ্টি খাওয়াতে হলে সূর্য মোদক ও তাঁর ছেলে সিদ্ধেশ্বর অনেক চিন্তাভাবনার পরে তালশাঁসের মতো দেখতে এক অভিনব সন্দেশ তৈরি করলেন। তার ভিতরে থাকল গোলাপজল মেশানো ছোলোর রস। তখন গুড় পাক করে যে চিনি তৈরি হত তাকে ছোলো বলা হত। আশ্চর্য সূর্যকুমারের সেই জলভরা তৈরির কৌশল। কড়াপাকের সন্দেশ, তার ভিতরে গোলাপজল একই রকম থাকত। জল শুষে নিত না সেই সন্দেশ। বাংলার মিষ্টান্ন শিল্পের এই জলভরা তালশাঁসই নতুন ইতিহাস রচনা করেছে। রবীন্দ্রনাথ ঠাকুর বজরা করে এসে নামতেন চন্দননগরের পাতালবাড়ির ঘাটে। সূর্য মোদকের কাছে মিষ্টির 'অর্ডার' দিতেন। সূর্য মোদক নিজে কবির জন্য নিয়ে যেতেন জলভরা, মোতিচুর সন্দেশ, ক্ষীরপুলি সন্দেশ। শোনা যায়, মোতিচুর নামটি রবীন্দ্রনাথের দেওয়া। সেই মিষ্টির স্বাদে মুগ্ধ হয়ে তিনি বলেছিলেন, 'এ তো মোতিচুর'। সেই থেকে ওই সন্দেশের সঙ্গে মোতিচুর নামটি জুড়ে গেল।

সূর্যকুমারের প্রতিভা শুধু নতুন মিষ্টি তৈরির কাজেই ক্ষান্ত থাকেনি, তিনি রীতিমতো কাব্যচর্চাও করতেন। রবীন্দ্রনাথ বরাবরই নতুন কবিদের উৎসাহ দিতেন। তিনি রীতিমতো কাব্যচর্চাও করতেন। রবীন্দ্রনাথ বরাবরই নতুন কবিদের উৎসাহ দিতেন। তিনি কি পড়েছিলেন সূর্যকুমারের লেখা পাঁচালি 'গীতগোবিন্দ'? সূর্যকুমার কি কখনও তাঁর কবিতা নিয়ে আলোচনার সময় ও সুযোগ পেয়েছিলেন রবীন্দ্রনাথের সঙ্গে? এই দুটি প্রশ্নের উত্তর জানা নেই। তবে সূর্যকুমারের পারিবারিক সূত্রে জানা যায়, তাঁর লেখা 'গীতগোবিন্দ' আজও সুরক্ষিত আছে চন্দননগরের ফরাসি মিউজিয়ামে।

জলাভরা তালশাঁস কিংবা গেপালগোল্লার মতো মিষ্টান্ন থেকে অনায়াসে একটি সিদ্ধান্তে পৌঁছে যেতে পারি আমরা। গ্রামবাংলার একটি বড় ঐতিহ্য এই মিষ্টান্ন। অখ্যাত প্রত্যন্ত এক একটি জনপদে স্বাদে গন্ধে অতুলনীয় এমন সব মিষ্টি তৈরি হয়, যেগুলি বাঙালির রুচি ও মননের নির্দিষ্ট প্রমাণ। বাঙালির পোশাক-আশাক, হস্তশিল্প, পোড়া মাটির মন্দির শিল্প, তাঁতের কাপড়, কুটির স্থাপত্য, ভাস্কর্য এবং এ ধরনের বিভিন্ন সৃজনমূলক কাজের নেপথ্যে যে মানসিক প্রক্রিয়া, তারই সমান্তরাল বিকাশ ঘটেছে এবং তা সম্প্রসারিত হয়েছে মিষ্টান্ন শিল্পে। সভ্যতা যত প্রাচীন এবং সর্বাত্মক, ততই সূক্ষ্ম থেকে সূক্ষ্মতর হয় রন্ধনশিল্প, যার প্রকাশে বিচিত্র থেকে বিচিত্রতর হয় মিষ্টান্ন জাতীয় খাদ্যদ্রব্য। ব্যান্ডেল-কাটোয়া

ছানার মিষ্টিতে চকোলেট মেশানো হয় ইদানীং। কতটা ছানা কতটা চকোলেট, তার পরিমাণ নিজের অভিজ্ঞতা দিয়ে ঠিক করেন হালুইকর। ছানার সাদা রঙে মেশে চকোলেটের খয়েরি রং। এই মিশ্রণের ফলে মিষ্টির স্বাদ কেমন হবে, তিনি জানেন। পাকা হাতের কাজ। ছানা এবং চকোলেট দুটোর স্বাদই বহাল থাকে। চিনির রসের সঙ্গে তরল নলেন গুড় মিশিয়ে এভাবেই তৈরি হয়েছে নলেন গুড়ের রসগোল্লার রসায়ন। নিঃশব্দে এই পরিবর্তন হয়েছে। আগামী দিনেও হয়তো হবে।

রেলপথে সোমড়া বাজার আসার দু-তিনটি স্টেশন আগে থেকেই থালায় মিষ্টি সাজিয়ে সেই থালা পরিষ্কার ন্যাকড়া, গামছা কিংবা তোয়ালে দিয়ে ঢেকে হকাররা ট্রেনে ওঠেন। প্রচণ্ড ভিড়ে ট্রেনে পা রাখার জায়গা নেই। তার ওপর, ট্রেনও ছুটছে। বৈদ্যুতিক ট্রেন, গতিও কিছু কম নয়। আবার গতি আস্তে আস্তে কমাতেও হয়, ট্রেন স্টেশনে ঢোকার আগে। এই এত কিছুর মধ্যেও মিষ্টি সমেত থালা এক হাতের তালুতে বসিয়ে হকাররা কোনও কিছুর সাহায্য ছাড়াই দিব্যি নিখুঁত ভারসাম্য রেখে চলাফেরা করেন। ট্রেন হঠাৎ ব্রেক কষলে, কিংবা দাঁড়িয়ে থাকা যাত্রীদের কেউ একটু অসতর্ক হয়ে অতর্কিতে গায়ে এসে পড়লে মিষ্টির থালা ছিটকে যেতে পারে। ট্রেনের কামরার হাজার হাজার যাত্রীর জুতোর ধুলোয় ধূসর, অপরিচ্ছন্ন মেঝেতে ছড়িয়ে ছিটিয়ে যাবে মিষ্টি। তা কিন্তু হয় না। শুধু কাঁচাগোল্লা, মোহনভোগ ও রাজভোগ নয়, থাকে সেগুলি পরিবেশনের শালপাতা ও টিনের কেটলি ভর্তি জল। মিষ্টি খেলে জল পিপাসা পায়। কেউ কেউ আবার হাত ধোয়ার জন্য জলও চান। সব ব্যবস্থাই হাতের কাছে তৈরি রাখেন হকাররা। সকাল থেকে সন্ধে—আপ-ডাউন, ডাউন-আপ ট্রেনে চলতে চলতে তাঁরা নিত্যযাত্রীদেরও চেনেন। ধারে মিষ্টি বিক্রিও হয়। আবার অচেনা যাত্রীদেরও সমান খাতির করেন চলমান মিষ্টি বিক্রেতারা।

হুগলি জেলার জনাইয়ে বাড়ি বিখ্যাত ভীমচন্দ্র নাগের পিতা পরানচন্দ্র নাগের। জনাইয়ের শুধু একটি মিষ্টি বিখ্যাত। মনোহরা। আর সোমড়া বাজারের তিনটি মিষ্টি সারা দেশের সম্পদ, দামেও সস্তা। এই সোমড়া বাজারের তিনিটি মিষ্টিই ট্রেনে বিক্রি হয়। রাজভোগ, মোহনভোগ, কাঁচাগোল্লা। সোমড়ার ভোলা ময়রার নাতজামাই নবীন ময়রা। তিনি আবিষ্কার করেন রসগোল্লা। তাঁর ছেলে কে সি দাস রসমালাইয়ের আবিষ্কর্তা।

মুর্শিদাবাদের কাঁদি অঞ্চল থেকে ছানা আসে সোমড়া বাজারে। হকাররা জানিয়ে দেন, কাঁদিতে ছানার দর কমেছে। সোমড়া বাজারের মিষ্টির দরও কমবে। ঠিক তা-ই। দাম কমে। বাড়েও। কিন্তু কখনও তা কলকাতার নামীদামি মিষ্টির দোকানগুলির চেয়ে বেশি নয়। মিষ্টির আকারও কলকাতার বেশিরভাগ মিষ্টির চেয়ে বড়।

ছানার মিষ্টিতে চকোলেট মেশানো হয় ইদানীং। কতটা ছানা কতটা চকোলেট, তার পরিমাণ নিজের অভিজ্ঞতা দিয়ে ঠিক করেন হালুইকর। ছানার সাদা রঙে মেশে চকোলেটের খয়েরি রং। এই মিশ্রণের ফলে মিষ্টির স্বাদ কেমন হবে, তিনি জানেন। পাকা হাতের কাজ। ছানা এবং চকোলেট দুটোর স্বাদই বহাল থাকে। চিনির রসের সঙ্গে তরল নলেন গুড় মিশিয়ে এভাবেই তৈরি হয়েছে নলেন গুড়ের রসগোল্লার রসায়ন। নিঃশব্দে এই পরিবর্তন হয়েছে। আগামী দিনেও হয়তো হবে। তবে সাবেক কালের রসগোল্লা বা সন্দেশ যে বাজার থেকে উঠে যাবে তা নয়। এগুলি সময় পরীক্ষিত। যুগে যুগে এরা বাঙালির মনে জায়গা করে নিয়েছে। সময়ের সঙ্গে পা মিলিয়ে আবার নতুন 'ডায়াবেটিক সন্দেশ'ও আছে মিষ্টির দোকানের কাচের আলমারিতে। সাবেক এবং নতুনের সহাবস্থান এখানে। নতুন, কারণ কয়েক বছর আগেও ডায়াবেটিক সন্দেশের চল ছিল না। ডায়াবেটিস রোগ এখন বেশি করে ধরা পড়ছে। তাই অনেক দোকান ডায়াবেটিক মিষ্টি তৈরি শুরু করেছে।

পুষ্পেশ পন্থ ও হুমা মহসিন-এর 'ফুড পাথ কুইজিন অ্যালং দা গ্র্যান্ড ট্রাঙ্ক রোড ফ্রম কাবুল টু কলকাতা' বইটিতে রসগোল্লাকে বলা হয়েছে 'কটেজ চিজ ডাম্পলিংস ইন সুগার সিরাপ'। পনির ও 'চিজ' এক কথা নয়। আল্পসের বরফ-মোড়া পাহাড় ঘেরা সুইজারল্যান্ডের অতিবিখ্যাত চিজ কলকাতার অভিজাত কয়েকটি 'শপিং মল'-এ পাওয়া যেতে পারে। কিন্তু বউবাজার কলেজ স্ট্রিট মোড়ের ছানাপট্টির ছানা ও সুইজারল্যান্ডের চিজের মধ্যে তফাত আকাশ-পাতাল। ষোড়শ শতক থেকে শুরু করে একুশ শতকের প্রথম পর্যন্ত গ্র্যান্ড ট্রাঙ্ক রোডের প্রায় ২৫০০ কিলোমিটার (রাডিয়ার্ড কিপলিং লিখেছিলেন ১৫০০ মাইল, জীবনের এই নদী পৃথিবীতে আর কোথাও নেই। 'কিম' উপন্যাসে তিনি এই রাস্তাটিকে অমর করে রেখেছেন)। দীর্ঘ যাত্রাপথের জানা-অজানা শহর-মহানগর ও জনপদের নানা খাবার ও সেগুলি তৈরির সচিত্র বিবরণ দিতে দিতে পুষ্পেশ পন্থ ও হুমা মহসিন এসে পৌঁছেছেন কলকাতা শহরে। এখানে তাঁরা ছোলার ডাল, কমলা ফুলকপি, পটোলের দোলমা, কচু শাকের ঘন্ট, বাংলা পোলাও, মুগ ডালের খিচুড়ি, সন্দেশ ও রসগোল্লার কথা লিখেছেন। কমলা ফুলকপিতে লাগে খোসা ও বীজ ছাড়ানো তিনটি কমলালেবুর মণ্ড, এক কেজি বা ২২ পাউন্ড ওজনের একটি ফুলকপি (উত্তর ভারতে ফুলকপি ওজন দরে

বঙ্গসংস্কৃতি তথা ভারতীয় সংস্কৃতির একটা বড় বৈশিষ্ট্য, বহু সাংস্কৃতিক উপাদান আমাদের মধ্যে মিশেছে। সাহিত্য, সঙ্গীত, চারুকলা, স্থাপত্য, ভাস্কর্য থেকে রন্ধন শিল্প।

বিক্রি হতে দেখেছি), খোসা ছাড়ানো চারটি আলু (আধখানা করে কেটে), তার সঙ্গে চার টেবিল চামচ সরষের তেল, দুটি তেজপাতা, তিন গ্রাম গরম মশালার গুঁড়ো, চারটি লবঙ্গ ও দুটি ছোট এলাচ। এর সঙ্গে দিতে হবে ছোট দুই টুকরো দারুচিনি, তিন গ্রাম হলুদ গুঁড়ো, ১৮ গ্রাম হলুদ, দুটি পেঁয়াজ, লঙ্কা গুঁড়ো তিন গ্রাম, জিরে গুঁড়ো (প্রয়োজন মনে করলে) ছ' গ্রাম, জল আধ কাপ বা ১২৫ মিলিলিটার, চিনি তিন গ্রাম, নুন (প্রয়োজন মতো) ও তিন-চারটি কাঁচালঙ্কা বাটা।

কমলা ফুলকপি বাঙালির পাতে দেখা যায় না। বইয়ে এই রান্নাটির যে পদ্ধতি বলা হয়েছে, তা এখানে বাংলা তর্জমায় দিয়ে রাখি ঃ

প্রথমে আলু জলে ধুয়ে নিয়ে হলুদ মাখিয়ে নিতে হবে। প্যানে তেল গরম (ধোঁয়া ওঠা পর্যন্ত) করে উনুনের আঁচ কমিয়ে প্যানে তেজপাতা, লবঙ্গ, সবুজ ছোট এলাচ ও দারুচিনি তাতে গরম করে নিতে হবে, যতক্ষণ না সুগন্ধ পাওয়া যায়। এবার এতে দিতে হবে হলুদ গুঁড়ো, জিরে, পেঁয়াজ ও লাল লঙ্কা গুঁড়ো। গন্ধ চাইলে একটু জিরে গুঁড়ো দেওয়া যেতে পারে। এই মসলার রং বদল না হওয়া পর্যন্ত হালকা উনুনে মসলাটি নাড়তে থাকুন। মসলা যাতে পুড়ে না যায় তার জন্য অল্প জল তার ওপরে ছিটোতে পারেন। এবার ফুলকপি, দুটি কমলালেবুর মণ্ড ও স্বাদ অনুযায়ী নুন দিন। জল মেশান। প্যানটি ঢাকা দিয়ে নরম আঁচে রাঁধুন।

আগুনের ইষৎ তাপেও রান্নাটি শুকিয়ে আসতে পারে। ঢাকনি খুলে মাঝেমধ্যে সে দিকে লক্ষ রাখতে হবে। রান্না বেশি শুকনো মনে হলে অল্প জল ছিটিয়ে দিন। অথবা আধ কাপ জলও দেওয়া যেতে পারে। উনুন থেকে প্যানটি নামানোর পাঁচ মিনিট আগে কুচো লংকা পুরোটা ছড়িয়ে দিন। ঝোল থাকবে না।

খাবার পরিবেশনের আগে রান্না হওয়া তরকারি অবশিষ্ট একটি কমলালেবুর মণ্ড দিয়ে সাজিয়ে নিন। মণ্ড ওই তরকারির ওপর বিছিয়ে তাকে সুন্দর চেহারা দিন।

অপ্রচলিত বলেই রান্নাটিকে নতুন বলেই গণ্য করা যেতে পারে।

বঙ্গসংস্কৃতি তথা ভারতীয় সংস্কৃতির একটা বড় বৈশিষ্ট্য, বহু সাংস্কৃতিক উপাদান আমাদের মধ্যে মিশেছে। সাহিত্য, সঙ্গীত, চারুকলা, স্থাপত্য, ভাস্কর্য থেকে রন্ধন শিল্প, পোশাক-আকাশ, ব্যবহারিক জীবন কোনওকিছুই এর ব্যতিক্রম নয়। এর মধ্যে আছে অ্যাংলো-ইন্ডিয়ান খাবারও। ভারত স্বাধীন হওয়ার পর তাঁরা অনেকেই অস্ট্রেলিয়ায় গিয়ে বসবাস শুরু করেছেন। তাঁদের কর্মসূত্রে দেখা যেত রেল কলোনিতে, চা ও কফি বাগানে ম্যানেজারদের বাংলোয়, ক্যান্টনমেন্টে। ব্রিটিশ রাজ আমলে তাঁরা ইংরেজদের কিছু খাবার ভারতীয়দের খাদ্যরুচির অন্তর্ভুক্ত করেন। যেমন কাটলেট, রেলওয়ে মাটন (খাসি, পাঁঠার মাংস), চিকেন কারি (মুরগির মাংস), ডাকবাংলো রোস্ট ও নানা ধরনের কেক ও বেক, বিস্কুট। ক্যারামেল কাস্টার্ড, স্যুপ, মিট বল, প্যাটিস, প্যাস্ট্রি ইত্যাদি অ্যাংলো-ইন্ডিয়ানরাই এদেশে জনপ্রিয় করেছেন। ব্রিটিশ আমলে কলকাতা ভারতের রাজধানী থাকার সুবাদে বড়দিন ও ইংরেজি নববর্ষে কেক-প্যাস্ট্রি-বিস্কুট এদেশে আস্তে আস্তে গৃহীত হয়ে যায়। আর এখনকার বিশ্বায়নের যুগে ও হুজুগে

গুড় থেকে চিনি, চিনি থেকে মিছরি। মিছরি থেকে ওলা এবং তা খণ্ড তৈরি করে দেবতাকে নিবেদন করা হত। খণ্ড ছিল সেকালের শ্রেষ্ঠ মিষ্টান্ন। কেমন ছিল এই মিষ্টি, তা লেখক জানাজানি। তবে অন্যান্য মিষ্টান্নের তুলনায় এটি যে শ্রেষ্ঠ, তাঁর কথা একবাক্যে মেনে নিতেই হয়। খণ্ড লুপ্ত হয়ে গিয়েছে বহুকাল আগেই। এটাই যা দুঃখের। ইতিহাসের আসন থেকে তাকে বিচ্যুত করাও ঠিক নয়। কাঁথির কাজুবাদামের সন্দেশ এখন এই আসনটি নিয়েছে। দেবভোগ্য এই সন্দেশ দেশনেতা জওহরলাল নেহরুও ভালোবাসতেন।

আমেরিকা, চিন, ইতালির খাবারের ছড়াছড়ি এদেশে। সুস্বাদু খাবার বলেই এদেশের মানুষ এগুলি সহজেই গ্রহণ করেছে দেশ-বিদেশের কোনওরকম সঙ্কীর্ণতা না রেখেই। শ্রীনিত্যানন্দ বিনোদ গোস্বামী প্রায় এই কথাটাই লিখেছেন তাঁর 'বাংলা সাহিত্যের কথা' (বিশ্বভারতী গ্রন্থালয়, ২ বঙ্কিম চাটুজ্যে স্ট্রিট, কলিকাতা, প্রকাশ মাঘ, ১৩৪৯, সংস্করণ জ্যৈষ্ঠ, ১৩৫২) বইটিতে:

দেখা যায়, আমরা যে খাদ্য খাই, তাতে আমাদের জীবনরক্ষা হয়। কিন্তু সেই খাদ্য নিছক একজাতীয় নয়। ভাতের সঙ্গে নানা প্রকার তরিতরকারি, তা ছাড়া মিষ্টান্নও খেয়ে থাকি। উপকরণ বৈচিত্র্যে ভোজের গৌরব বাড়ে।

মিষ্টান্নের কথাই যখন উঠল, আমাদের শরণাপন্ন হতে হয় বাসুদেবপুর ন্যায়ভূষণপাড়ার কবিরত্ন পঞ্চানন রায়ের 'বাংলার মন্দির' বইটির। যিনি নিজেকে বলেছেন পরিব্রাজক। যথার্থ এই পরিচয়। মেদিনীপুরের সুদূর এক গ্রাম থেকে তিনি মাইলের পর মাইল পায়ে হেঁটে, না হয় গরুর গাড়িতে ঘুরে ঘুরে বাংলার এত গ্রাম ঘনিষ্ঠভাবে দেখেছেন এবং নিজের খরচে যে বইটি লিখেছেন, আকরগ্রন্থ হিসেবে তার দৃষ্টান্ত আমাদের সাহিত্যে কমই আছে। সাহিত্যরত্ন হরেকৃষ্ণ মুখোপাধ্যায়ের 'বীরভূম বিবরণ'-এর সঙ্গেই তার তুলনা চলে। বাংলার মন্দিরের সঙ্গে তিনি দেব-দেবীর প্রসাদ, ভোগ এসবেরও পরিচয় দিয়েছেন। কান্তনাথের ভোগে বাংলার বৃহত্তম লুচি প্রসঙ্গে তিনি লিখেছেন:

দিনাজপুরের কান্তনগরে মন্দির ও একটি ঠাকুরবাড়ী ছিল। এখানকার ভোগের লুচি বঙ্গে সর্ববৃহৎ। ইহা একটি বড় বর্গী থালার মত। বহু দূর দুরান্তরের যাত্রী এই লুচি প্রসাদ বাড়িতে লইয়া যাইতেন। কয়েক দিনেও খারাপ হইত না। দুই হাতে ধরিয়া ছিঁড়িয়া ক্ষীর, দই বা ডাল যোগে ইহা খাওয়া হইত।

আবার মেদিনীপুরের পলাশির ক্ষুদ্রতম লুচির প্রসাদ প্রসঙ্গে তিনি জানিয়েছেন: দক্ষিণপূর্ব রেল পথের রাধামোহনপুর স্টেশনের সন্নিহিত পলাশি গ্রামের নন্দী জমিদারদের ঠাকুর বাড়ির চাঁদনী মন্দির বাং ১২৩১ সালে নির্মিত। এখানকার লুচি ভোগ সর্বাপেক্ষা ছোট। ইহা একটি টাকার মত। ক্ষীরযোগে নিবেদন ও বিতরণ হয়।

গ্রন্থকার পঞ্চানন রায় মশাই বইটির ভূমিকার শেষে তারিখ দিয়েছেন ১৮. ১১. ৭৪, এরই কাছাকাছি সময়ে বইটি প্রকাশিত হয় নুমান করা যায়। তখন কি ফুচকা ছিল না? এক টাকার ধাতব মুদ্রার মতো কি পলাশির চাঁদনি মন্দিরের লুচি? হতেও পারে।

পঞ্চানন রায় লিখেছেন, 'আত্মবৎ সেবা' শাস্ত্রের এই নির্দেশ অনুযায়ী নিজের যা ভালো লাগে সেটাই দেবতাকে নিবেদন করতে হয়। নিবেদিত প্রসাদ পরে দিতে হবে প্রার্থী ও ভক্ত-অতিথিদের। 'একাকী মিষ্টান্ন ভোজন করিলে প্রায়শ্চিত্ত করণীয়' লেখক জানিয়েছেন।

গুড় থেকে চিনি, চিনি থেকে মিছরি। মিছরি থেকে ওলা এবং তা খণ্ড তৈরি করে দেবতাকে নিবেদন করা হত। খণ্ড ছিল সেকালের শ্রেষ্ঠ মিষ্টান্ন। কেমন ছিল এই মিষ্টি, তা লেখক জানাজানি। তবে অন্যান্য মিষ্টান্নের তুলনায় এটি যে শ্রেষ্ঠ, তাঁর কথা একবাক্যে মেনে নিতেই হয়। খণ্ড লুপ্ত হয়ে গিয়েছে বহুকাল আগেই। এটাই যা দুঃখের। ইতিহাসের আসন থেকে তাকে বিচ্যুত করাও ঠিক নয়। কাঁথির কাজুবাদামের সন্দেশ এখন এই আসনটি নিয়েছে। দেবভোগ্য এই সন্দেশ দেশনেতা জওহরলাল নেহরুও ভালোবাসতেন।

লেখকের দেওয়া তালিকা অনুযায়ী মেদিনীপুর জেলার উল্লেখযোগ্য মিষ্টান্নের মধ্যে আছে গোপীবল্লভপুরে মগধ লাড্ডু, ঝাড়গ্রামের রসকদম্ব ও ক্ষীরকদম্ব, মেদিনীপুরের ক্ষীরের গজা, তমলুক রাধামণির সন্দেশ, মহিষাদলের মিহিদানা, কোলাঘাট অঞ্চলের তালগুড়ের মুড়কি, লোয়াদার বিরির জিলাপি, মিছরির রস ঢলকন, নাড়াজোলের মুগের জিলিপি, চাঁইপাটের বাতাসা, ক্ষীরপাইয়ের বাবরসা, চন্দ্রকোণার মালপোয়া, মুগের মিঠাই, চাঁদসাহি খাজা, ধলভূমের পোস্তদানার মতো সীতাভোগ ও নারায়ণগড়ের মুড়কি। একটি মুড়কি হাতে নিয়ে চাপ দিলে ঘি বেরিয়ে আসে। চাঁইপাটের এক-একটি বাতাসা বড় বর্গি থালার মতো। এসব মিষ্টিই বাংলার মানসিক সমৃদ্ধি ও সম্পদের প্রতীক। এক-একটি মিষ্টির এক-একরকম শিল্পনৈপুণ্য, যা উৎসাহী ক্রেতার মনোযোগ দাবি করে।

মঠ ও মন্দিরকে কেন্দ্র করে বাংলার বিভিন্ন স্থানে এক-একটি মিষ্টির উদ্ভব

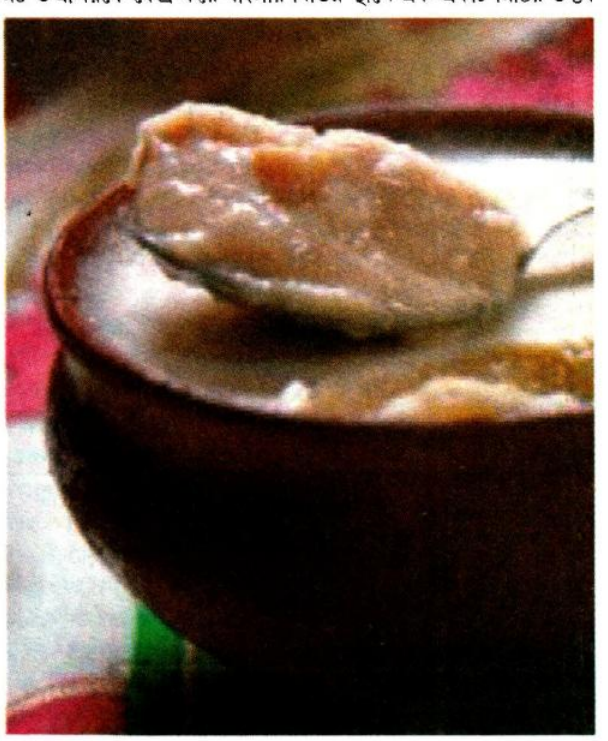

বর্ধমানের বিখ্যাত সব মিষ্টির মধ্যে আছে মিহিদানা, সীতাভোগ, খাজা, ভাতারের সন্দেশ। গোপাল ময়রা তৈরি করতেন স্পঞ্জ ধরনের রসগোল্লা, যার নাম গোপালগোল্লা।

হয়েছে, যা স্থানীয় মানুষ সমাদর করে আসছেন বহু যুগ ধরে। সারা বছর মঠ-মন্দিরে ভক্ত-সমাবেশেরও শেষ নেই। তাই ক্রেতাদের আনুকূল্য পেয়েছে এইসব মিষ্টি। বাংলার নিম্বার্ক মঠের প্রধান কেন্দ্রগুলি হল বর্ধমানের রাজগঞ্জ, উখড়া, মুর্শিদাবাদ-লোহাগঞ্জ, নদিয়ার আড়ংঘাটা, বীরভূমের জয়দেব-কেঁদুলি (কেন্দুবিল্ব), মেদিনীপুরের দাসপুরের কেতুড়া বৈকণ্ঠপুর। রাজগঞ্জের দেবতা ঁরাধাদামোদর জিউ, বৈকুণ্ঠপুরের ঁবিহারিজিউ। এইসব জায়গায় ভোগের উপচার মখুনা, পণঝুরি, তোকমাই, মালপোয়া। মখুনা শক্ত গুড়পিঠের মতো নোনতা খুদের পিঠে। পণঝুরি হল শুকনো হালুয়া, তোকমাই হল পায়স, যাতে দুধের পরিমাণ বেশি থাকে। মখুনা নিয়মিত তৈরি হয়, অন্যান্য মিষ্টি হয় বিশেষ বিশেষ উপলক্ষে।

উখড়ার জিলিপি এক-একটি গোরুর গাড়ির চাকার মতো, পঞ্চানন রায় লিখেছেন। সে মিষ্টি আমরা চোখে দেখিনি, তবে বীরভূমের সিউড়ি অঞ্চলের রুটির মতো বড় বড় লুচি দেখেছি। যেগুলিকে বলা হয় হাতিপায়া লুচি।

বর্ধমানের বিখ্যাত সব মিষ্টির মধ্যে আছে মিহিদানা, সীতাভোগ, খাজা ও বর্ধমান-কাটোয়া ছোট লাইনে ভাতারের সন্দেশ। ভাতার তখন গ্রাম, আস্তে অস্তে এই গ্রাম ছোট শহরে রূপান্তরিত হয়েছে। ভাতার গ্রামের গোপাল ময়রা তৈরি করতেন স্পঞ্জ ধরনের রসগোল্লা, যার নাম গোপালগোল্লা। এ ছাড়া মানকড়ের চিনির ছোট ও বড় কদমা, ওলা, শক্তিগড়ের ল্যাংচা ও বর্ধমান শহরের তিলের সন্দেশ বিখ্যাত। শক্তিগড়ে গ্র্যান্ড ট্রাঙ্ক রোডের দুপাশে ছিল ল্যাংচার দোকান। দুর্গাপুর এক্সপ্রেস হাইওয়ে তৈরির পর দোকানগুলি উঠে এসেছে কাছের আমড়া গ্রামের পাশে এই নতুন রাস্তায়। আমড়ার ল্যাংচাই শক্তিগড়ের ল্যাংচা।

বাঁকুড়া জেলার ইন্দাসের খাজা, বেলিয়াতোড়ের ম্যাচা, খাতড়ার বুটের মিঠাই, সিমলাপালের পান্তুয়া, বিষ্ণুপুরের মোতিচুর ও কাঁচাগোল্লার নাম আছে। মুগডাল বেটে সন্দেশের মতো পাক করে তার উপরে চিনির প্রলেপ দিয়ে ম্যাচা তৈরি করতে হয়। বেলিয়াতোড়ের বাসস্ট্যান্ডে বাস গিয়ে থামলে মিষ্টির দোকানের কর্মীরা ঝুড়িতে শালপাতা দিয়ে ম্যাচা নিয়ে এসে যাত্রীদের বিক্রি করেন। বেলিয়াতোড় থেকে একটি রাস্তা যাচ্ছে বাঁকুড়া-পুরুলিয়ার দিকে, আর একটি রাস্তা বাঁ দিকে যাচ্ছে ছান্দার-সোনামুখী থেকে বিষ্ণুপুর। বেলিয়াতোড়ে রাষ্ট্র স্তার মোড়ে মিষ্টির অনেক দোকান আছে। ম্যাচা তাদের অন্যতম প্রধান বিক্রির জিনিস। জনাইয়ের বিখ্যাত মনোহরাও এর কাছে হার মানত। ছানা ও সন্দেশের উপর চিনির প্রলেপ দিয়ে তৈরি হয় এই ম্যাচা। বেলিয়াতোড়ের ম্যাচার রং হলদে, জনাইয়ের ম্যাচা সাদা। জনাইয়েই থাকতেন ভীমচন্দ্র নাগ। যিনি পরে বউবাজার-ওয়েলিংটন স্ট্রিটে (বিধান সরণি) তাঁর মিষ্টির দোকান করেন। তাঁর মিষ্টির বিশাল নাম-ডাক আছে। বিষ্ণুপুর মহকুমা শহর। এখানে ষোড়শ শতকের মল্লরাজাদের বহু মন্দির আছে, যার জন্য শহরটিতে পর্যটকদের ভিড় লেগেই থাকে। এই শহরের কাঁচাগোল্লা ও মোতিচুরের খ্যাতি ছিল। এক সময় পিয়াল বীজের বেসনে মতিচুর তৈরি হত। বাঁকুড়া, মেদিনীপুর, পুরুলিয়ার লাল মাটিতে শাল-পিয়ালের অভাব ছিল না। পঞ্চানন রায় লিখেছেন, মিহিদানার মতো

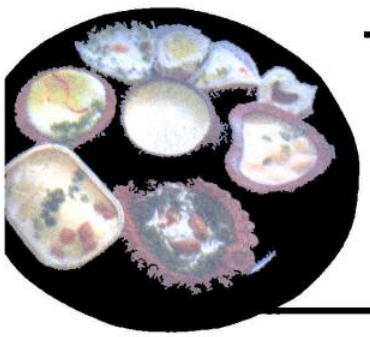

সিউড়ির মোরব্বার সঙ্গেও জড়িয়ে আছে ইতিহাসের এক অধ্যায়। বীরভূম জেলার প্রাচীন রাজধানী নগর ছিল মোরব্বার উৎপত্তিস্থল। সেখানকার মোদকরা রাজবাড়ির বাগানের গাছপালা ও ফলমূল পরিচর্যা ও সংরক্ষণের দায়িত্ব পেয়েছিলেন। ফল বহুবার জলে ভিজিয়ে, সিদ্ধ করে চিনির রসে পাক করে মোরব্বা হয়। চিনির কড়া পাকই সংরক্ষণের কাজ করে। কয়েক শতাব্দী পুরোনো এই শিল্পটি নগর থেকে চলে এসে সিউড়িতে নতুন ব্যবসা শুরু করেছে বহু আগেই।

দেখতে এই মোতিচুর যে ময়রা আবিষ্কার করেন, তাঁকে মণ্ডল উপাধি দিয়েছিলেন তদানীন্তন মল্লরাজা।

হুগলি জেলার খানাকুল-কৃষ্ণনগরের কারকান্ডা নামের মোয়া ও রাজহাটির মোহনমোয়ার নাম আছে। হাওড়া জেলার উলুবেড়িয়ার পান্তুয়ারও কম খ্যাতি নেই। পান্তুয়া ও গজা বিখ্যাত আমতার।

নদিয়ার সদর শহর কৃষ্ণনগরের সরভাজা, সরপুরিয়া, রসাকর, সরতক্তি ও দেদো মন্ডা, শান্তিপুরের নিকুতি ও খাসা মোয়ার নাম মুখে মুখে ফেরে। কৃষ্ণনগরের অধরচন্দ্র দাসের সরভাজা, সরপুরিয়া বহু বছর ধরে উৎকৃষ্ট মান বজায় রেখেছে। রানাঘাটের পান্তুয়া, মুড়াগাছার কাঁচাগোল্লা ও ছানার জিলিপির মানও বেশ উন্নত।

দক্ষিণ ২৪ পরগনার জয়নগরের মোয়া, মুড়কি, মুগের পাটালি, খোলাখালি গোবিন্দপুরের চালের পাটালি বিখ্যাত। শীতের শুরুতেই জয়নগরের নলেন গুড়ের মোয়ার অনেক দোকান হয় কলকাতায় ও আশেপাশে। অস্থায়ী দোকান। গরম পড়লেই তারা উঠে যায়। পরের বছর আবার নিজের নিজের জায়গায় ফিরে আসে। সরু ও ঈষৎ মোটা চিঁড়ের মোয়া। সেই সঙ্গে বিক্রি হয় লম্বাটে পোড়ামাটির হাঁড়িতে তরল নলেন গুড় ও মোটা কাগজের প্যাকেটে নলেন গুড়ের পাটালি। এই মোয়া ও গুড়ের চাহিদা আছে।

ডায়মন্ড হারবারের কাছে নীলে গন্ডাবেড়ের নারকেল গুড়, খেজুর গুড় ও তাল গুড় বিখ্যাত। তাল গুড়ের জন্য নাম আছে সহরারহাট গ্রামের। নারকেল গুড় সাদা। বুড়ুল, চাঁদনগর ও মোল্লার চকের চিনিপাতা দই গ্রামগুলির সম্পদ। দইয়ের জন্য ওইসব জায়গায় যাওয়ার দরকার ছিল না। গড়িয়ায় একটি দোকান (মিষ্টির নয়) ছিল যার বাইরে লেখা ছিল—এখানে মোল্লার চকের দই পাওয়া যায়। এর অর্থ, মিষ্টি দইয়ের জন্য বিখ্যাত কলকাতা শহরেও মফস্সলের এই দইয়ের চাহিদা ছিল।

মালদহের রসকদম্ব, মোহনভোগ ও খাজার কথা না বললে তালিকা সম্পূর্ণ হবে না। টাঁরা নামের গোল পরোটা ও রস ভরে এই খাজা হয়। উত্তরবঙ্গে আর একটি খাবার পাওয়া যায়, তাম ভাকা। আলো চাল ভাপে সিদ্ধ করে দুধ ও গুড় দিয়ে এই মিষ্টি খাবারটি তৈরি হয়। সর ঘিয়ে ভেজে তা চিনি দিয়ে ডেলা করে খোয়া মিশিয়ে তৈরি হয় দার্জিলিঙের তিল মোদক।

কলকাতা শহর ও মফস্সল বাংলার গ্রামে গ্রামান্তরে এত ধরনের মিষ্টি যে, সেগুলির সম্পূর্ণ তালিকা তৈরি অত্যন্ত কঠিন। তাদের তৈরির পিছনে হালুইকরের যে নিজস্ব বুদ্ধি, দক্ষতা ও নৈপুণ্য সদাসক্রিয়, তা আর বলার অপেক্ষা রাখে না। বৈচিত্র্যের দেশ বাংলা। এক-এক জায়গায় এক-এক রকম হস্তশিল্প, আলাদা আলাদা তাঁতের বস্ত্র ও মিষ্টান্ন।

এক-একটি মিষ্টির সঙ্গে আবার বিশিষ্ট কারও কারও নামও জড়িয়ে আছে। ব্রিটিশ আমলে মহারানি ভিক্টোরিয়ার প্রতি শ্রদ্ধায় পুঁটিরাম তৈরি করেন পুর ভরা গজা, যার নাম তিনি দিয়েছিলেন এম্প্রেস গজা। বহরমপুরের মোদক সিপাহি বিদ্রোহের শেষে বড়লাট-পত্নী লেডি ক্যানিং-এর নামে তৈরি করেন পান্তুয়া জাতীয় মিষ্টি। লোকমুখে এই মিষ্টিরই নাম হয়ে যায় লেডিকেনি। ক্ষীরপাইয়ের বিখ্যাত মিষ্টি। বাংলায় আর কোথাও এই মিষ্টি তৈরি হয় না। ক্ষীরপাইয়ের রেসিডেন্ট এডওয়ার্ড বাবর ছোট শহরটিকে বর্গির হামলা থেকে রক্ষা করায় পরনে আটা নামে শহরের এক মোদক তাঁর নামে এই মিষ্টিটি তৈরি করেন।

এভাবে সিউড়ির মোরব্বার সঙ্গেও জড়িয়ে আছে ইতিহাসের এক অধ্যায়। বীরভূম জেলার প্রাচীন রাজধানী নগর ছিল মোরব্বার উৎপত্তিস্থল। সেখানকার মোদকরা রাজবাড়ির বাগানের গাছপালা ও ফলমূল পরিচর্যা ও সংরক্ষণের দায়িত্ব পেয়েছিলেন। ফল বহুবার জলে ভিজিয়ে, সিদ্ধ করে চিনির রসে পাক করে মোরব্বা হয়। চিনির কড়া পাকই সংরক্ষণের কাজ করে। কয়েক শতাব্দী পুরোনো এই শিল্পটি নগর থেকে চলে এসে সিউড়িতে নতুন ব্যবসা শুরু করেছে বহু আগেই। প্রায় পরিত্যক্ত শহর নগর। এই শহরই রাজনগর। সিউড়ির বাসস্ট্যান্ড ও কোর্টের পাশে বড় রাস্তায় মোরব্বার কয়েকটি দোকান আছে। সিউড়ি বাজারেও আছে মোরব্বার দোকান। দোকানে অন্যান্য মিষ্টি, চা-শিঙাড়া, কচুরি প্রভৃতি পাওয়া যায়।

দোকানের নামে কিন্তু মোরব্বা কথাটি থাকে। যেমন মোরব্বা মিষ্টান্ন ভান্ডার। কোর্টপাড়ায়, বাসস্ট্যান্ডে, বাজারে বাইরের লোকজনের নিত্য যাতায়াত। মোরব্বা কিনে তাঁরা বাড়ি ফেরেন। তেতো করলাও মোরব্বা চিনির কড়া পাকে তিক্ততা হারিয়ে ফেলে। মোরব্বা হওয়ার পর করমচা, কামরাঙা, চালতা, তেঁতুলও টক থাকে না। ❖

মিষ্টিনাম জপ

ভগবানদাসের ছেলের জল তেষ্টা পেতে নবীন ময়রা এগিয়ে যান। শুধু জল দেওয়া ময়রা-সভ্যতায় নীতিবিরুদ্ধ। তাই জলকে চল রসে ডোবানো ছানার গোলক। তেষ্টা মিটল। তৃপ্তি মিটল না। এ আবার কেমন মিষ্টি! একেবারে স্পঞ্জের মতো! ভিতরটা রসের পুকুর।

প্রসেনজিৎ দত্ত

ডাকনাম ধরে সুর টানল সুমন্তদা—'তুই ভাবতে পারবি না রাজা, কী খেলাম! এক্কেবারে পেটে আর পিঠে।' আর আমার মাথায় প্রবাদ এল, 'অধিক খেতে করে আশা, তার নাম বুদ্ধিনাশা।' কী জানি কী বলবে সুমন্তদা! কিছু জিজ্ঞেস করার আগেই সুমন্তপ্রভুর ঠোঁট রেলগাড়ি চালাল। 'গতকাল ছিল বিয়েবাড়ি।' পেটে হাত বোলাতে বোলাতে এমনভাবে এ কথা বলল সুমন্তদা, মনে হল আঁটিশুদ্ধু গোটা আমটিকেই চুষে ফেলেছে। বিচিত্র সেলুকাস, এ দেশে বাঙালিরা সবই পারেন! এখন ভাবা, কী এমন খেল সুমন্তদা? এক ক্ষুরে মাথা কামানোর তোড়জোড় করে এ কথা পরিষ্কার যে, অধিক ভোজে আহ্লাদি হয়েছে সে। নাহ, সুমন্তদার নোনতায় আগ্রহ নেই বিশেষ। কথা শুরু হল রসগোল্লা আর সন্দেশ দিয়ে। ছোটবেলায় ধাঁধা খেলতাম। কোন ছানায় মিঠাই গড়ে না, কোন দেশে মাটি নেই... এই সব। সেই আদ্দিকালের কথা আবার মনে পড়ল। ধন্য, ধন্য তুমি সুমন্তদা—আলবাত বল তুমি। 'তুই চিনির বলদ হয়ে মর শালা। কোথায় বাঙালি হয়েছিস, একটু রসিয়ে রসিয়ে শুনবি, তা নয়, কানের মাথা খেয়ে রেখে দিলি তখন থেকে!' শুরু করল সুমন্তদা।

শালির বিয়েতে রানাঘাট গিয়েছিল সুমন্তদা। বনেদি বাড়ি, ব্যাপারসাপার আলাদা। ও বাড়ির অতিথি আপ্যায়ন শুরু হয় তামার থালায় সাজানো গোটা ছয়েক রসগোল্লা দিয়ে বরণ করে। কারণ, ঐতিহ্য। তবুও প্রশ্ন করেছিল সুমন্তদা, ওর শ্বশুরমশাইকে—'কেন আপনাদের এই নিয়ম বাবা?' শ্বশুরমশাই বিলাসী মানুষ। আপাদমাথা চুলকে রাসভারী গলায় বলেছিলেন—'গাই বাছুরে ভাব থাকলে মাঠে গিয়েও দুধ দেয়, বুঝলে বাবাজীবন?' স্বভাবতই বোঝেনি তাঁর জামাই। একটু মৃদু হেসে শ্বশুরমশাই জানিয়েছিলেন—'তোমার গোভাগ্য নেই দেখছি বাবা, তুমি দেখছি গোমুখ্খু! জানো না, আমাদের রানাঘাটেই রসগোল্লার আবিষ্কার হয়েছিল। হারান ময়রা ছিল স্বয়ং কেষ্টঠাকুর। তাঁর আশীর্বাদেই তো আজ এত সুখ। ওনার গাইবাছুর মন্ত্রপুত ছিল বুঝলে। নইলে অমন দুধে অমন ছানা কাটত না!' সালটা

BEGIN YOUR MORNINGS WITH THE TOUCH OF PURITY.

NON-ALCOHOLIC, LONG-LASTING, PERFUMED DEOS

Premium Deo

Aamir
Deodorant Body Spray

Isfahan
Deodorant Body Spray

Firdaus
Deodorant Body Spray

Rayhaan
Deodorant Body Spray

Also available in 50ml

"Available at All Exclusive Shops"

TRADE ENQUIRIES : For West Bengal and Orissa : R & R Network
Mobile: 9433146465 . E-mail : cdr.kolkata@yahoo.in
Tel. : 022-23712345 . E-mail : customarcare@5thsense.com

একটা মিষ্টি গপ্পো চালু আছে। হারাধন ময়রার শিশু কন্যা কাঁদছিল। তাকে সান্ত্বনা দেওয়ার জন্য উনুনের কড়ার রসের উপর তিনি ছানা ফেললেন। নতুন মিষ্টি তৈরি হল।

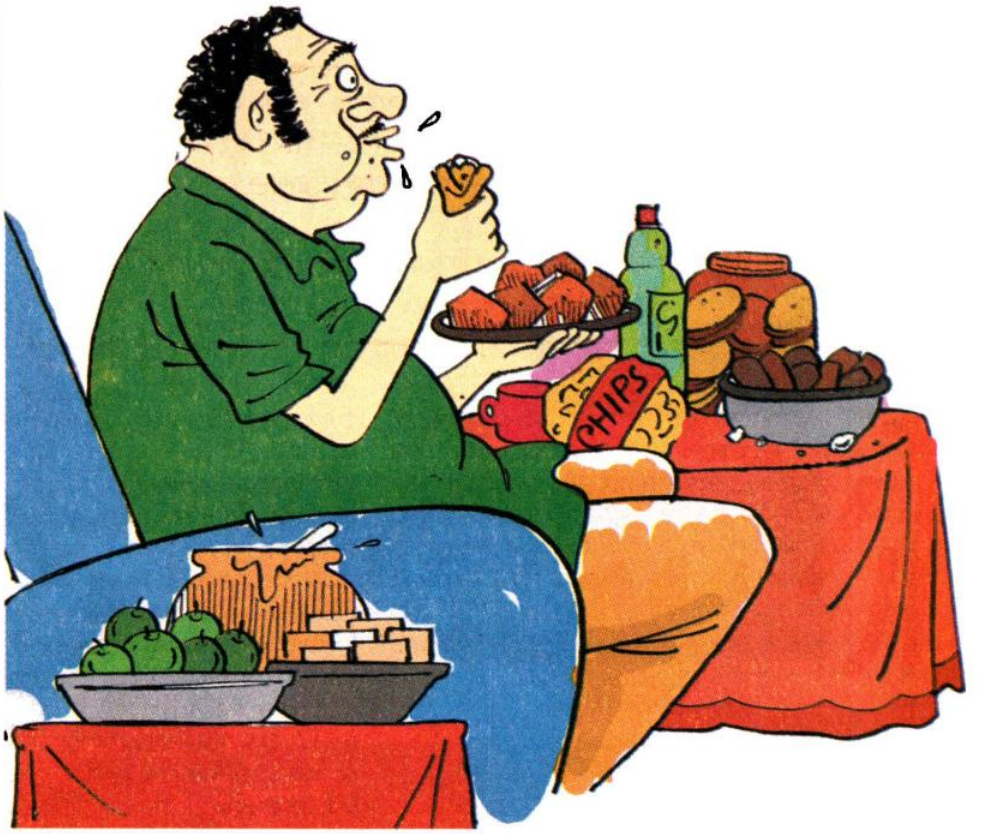

আন্দাজ ১৮৪৬-৪৭। ময়রার নাম ছিল হারাধন মণ্ডল। একটা মিষ্টি গপ্পো চালু আছে। হারাধন ময়রার শিশু কন্যা কাঁদছিল। তাকে সান্ত্বনা দেওয়ার জন্য উনুনের কড়ার রসের উপর তিনি ছানা ফেললেন। আশা, নতুন কিছু একটা তাঁর মেয়েকে দেবেন। উদ্দেশ্য সফল হল। মেয়ের মান ভাঙল আর নতুন মিষ্টিও তৈরি হল। রসের গোলোক বলে পালচৌধুরী বংশের জমিদারেরা এই বিশেষ মিষ্টিটির নাম দিলেন 'রসগোল্লা'।

এতদিন জানতাম নবীনচন্দ্র দাশ রসগোল্লা তৈরি করেছিলেন। এখন দেখছি সব ওলট পালট! সুমন্তদার অবস্থা দেখে মনে হচ্ছে—জামাইবাবুর পোড়া মুখ, মরা বাঁচা সমান সুখ! 'তা তুমি বললে কী?' অগত্যা, গুলিয়ে 'গ' হলেও হিল্লে তো একটা করতেই হবে—তাই জিজ্ঞাস্য। সুমন্তদা নাকি এই তথ্য ফাঁস করে আওড়েছিল—'বাগবাজারের নবীন দাশ/রসগোল্লার কলম্বাস।' এ তো ইজ্জতের সওয়াল! সে রাজবল্লভ পাড়ার লোক বলে কথা। শ্বশুরমশাই শুনে বলেছিলেন—'এই যুগটাই হল ইতিহাস বিকৃতির যুগ। দোষটা তোমার নয় বাবাজীবন, দোষটা সময়ের। তোমরা সব কিছু অর্ধেক জানো। সাল তারিখের কথা নখদর্পণে থাকলে এ কথা বলতে না। আর হ্যাঁ, একটু তো নিরপেক্ষ হতে শেখো বাবা। বাগবাজারে থাকো বলে তুমি পক্ষপাতদুষ্ট দেখছি।' মিষ্টি খেতে বসে এত বিপত্তি হবে কে জানত! ছেড়ে দে বাপ, পালিয়ে বাঁচি! কিন্তু সেই জো নেই। তারপর যা বলেছিলেন, তার সারমর্ম এই রকম—সুতানটি-বাগবাজার সলগ্ন চিৎপুর রোড বহু পুরোনো একটি রাস্তা। নবাবী সময়ে মুর্শিদাবাদ থেকে কালীঘাট পর্যন্ত যে রাস্তাটি ছিল তাকে ইংরেজরা বলত, 'Road to Kalighat'। ১৮২১ সালে রাস্তাটি নতুনভাবে তৈরি হয়েছিল। সেই জনপ্রিয় রাস্তাতে নবীন ময়রা ১৮৬৪ সালে মিষ্টির দোকান খুলে ব্যবসা শুরু করেন। ১৮৬৮ সালে একটি ঘটনা ঘটল। তৎকালীন পেরিনবাগ সংলগ্ন চিৎপুর অঞ্চলে একদিন ঘোড়াটানা জুড়িগাড়ি থামল নবীন ময়রার ছোট্ট মিষ্টির দোকানের সামনে। গাড়িতে সপরিবারে ছিলেন প্রখ্যাত কাঠের ব্যবসায়ী রায়বাহাদুর ভগবানদাস বগলা। ভগবানদাসের ছেলের জল তেষ্টা পেতে নবীন ময়রা এগিয়ে যান। শুধু জল দেওয়া ময়রা-সভ্যতায় নীতিবিরুদ্ধ। তাই জলকে চল রসে ডোবানো ছানার গোলক। তেষ্টা মিটল। তৃপ্তি মিটল না। এ আবার কেমন মিষ্টি! একেবারে স্পঞ্জের মতো! ভিতরটা একেবারে রসের পুকুর যে! ছেলের বায়না, 'আরও খাব।' একহাঁড়ি রসগোল্লা কিনলেন ভগবানদাস। এমন আদিম ছকছাঁদহীন মিষ্টিরও নামকরণ হল, 'রসগোল্লা'। এমন ছকছাঁদহীন স্পঞ্জি রসগোল্লার আবিষ্কারক নবীন ময়রা। যাকে ব্রিটিশরা ডাকলেন 'স্পো-বল'। কারণ রসগোল্লাকে দেখতে অনেকটাই তুষারখণ্ডের মতো। শ্বশুরমশাই বলেই চললেন—শোনা যায়, স্পঞ্জ রসগোল্লা বহরমপুরের ষোলো মাইল আগে ইসলামপুরের কাছে কালাভাঙাঘাটে ফটিক সরকার নামে এক ময়রা আবিষ্কার করেছিলেন। আবার ১৮৬৬ সালে কলকাতার হাইকোর্টের কাছে আর এক স্বনামধন্য ময়রা ছিলেন। নাম ব্রজ ময়রা। ইনিও নাকি রসগোল্লা আবিষ্কারের কাহিনির সঙ্গে যুক্ত। দীনু মোদকের

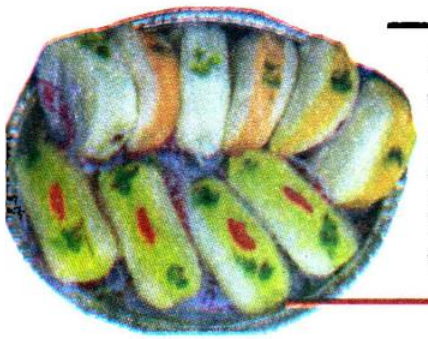

১৯০৫ সাল। বাংলার ছোটলাট লর্ড কার্জন (সস্ত্রীক) ও দু'জন হাইকোর্ট জজ বর্ধমানে সফরে আসবেন। রাজনির্দেশ এল—নতুন মিষ্টি খাইয়ে অতিথি বরণ করতে হবে। বোঁদের থেকেও ছোট দানার মিষ্টি দেখে মহারাজ বিজয়চন্দ্র বললেন, 'মিহিদানা'। আর হ্যাঁ, আরও একটা মিষ্টি ছিল মিহিদানার সঙ্গে—তা হল 'সীতাভোগ'। অনেকটা ভাতের মতো দেখতে বলে এই মিষ্টিকে ডাকা হয় সীতাভোগ নামে। সেই শুরু। কার্জনের চিত্তহরণের পর দেশে বিদেশে অনেকেই রসনাতৃপ্ত হয়েছে সীতাভোগের স্বাদে।

রসগোল্লা নামও উদ্ভাবনের সঙ্গে যুক্ত। আবার অনেকেই বলেন রসগোল্লা নাকি ওড়িষাতে প্রথম তৈরি হয়েছিল। সুতরাং, খাতায় নাম লেখানো কোনও ধ্রুব সিদ্ধান্ত পাওয়া যায় না। স্থৈর্যচুযতি লক্ষণম—যত মত তত পথ!

কথায় আছে, 'এঁটো খায় মিঠার লোভে, যদি এঁটো মিঠা লাগে।' ব্যাপারটা অনেকটা ঠিক এই রকমই। মিঠার লোভে জিলিপির প্যাঁচে পড়েছিল সুমন্তদা। এই অবস্থায় আমার আবার একটা কথা মনে পড়ছে। সুমন্তদাকে জানাতেই পিন খেলাম। 'হ্যাঁ জানতুম তো, তুমি বলবে না তা কি হয়, বেদেয় চেনে সাপের হাঁচি, বুঝলি! বলে ফেল—নো গৌরচন্দ্রিকা।' যাই হোক, ছোটবেলায় ঠাকুমার কাছ থেকে শোনা একটা ছড়া সুমন্তদাকে বললাম।

'ঘিরে ভাজা তপ্ত লুচি
দুচারি আদার কুচি
কচুরি তাহাতে খান দুই
ছোকা আর শাকভাজা
মতিচুর, বোঁদে, খাজা,
ফলারের জোগাড় বড়ই।
নিখুতি, জিলিপি, গজা
ছানাবড়া বড় মজা,
শুনে শক্‌শক্‌ করে নোলা
হরেক রকম মণ্ডা
যদি দেয় গণ্ডাগণ্ডা
যত খাই তত হয় তোলা।
খুরি পুরি ক্ষীর তায়,
চাইলে অধিক পায়,
কাতারি কাটিয়া শুখো দই।'

এ যে এক ছড়ায় বাজিমাত! সুমন্তদা শপথ করল, পরের বার আমাকে সে নিয়ে যাবেই তার শ্বশুরের কাছে। কথায় মজবার পাত্র আমি নই। ছড়া থেকে মিষ্টিগুলো আলাদা করলুম। মতিচুর, বোঁদে, খাজা, নিখুতি, জিলিপি, গজা, ছানাবড়া, শুখো দই—আহা! 'এবার আমি তোমার ক্লাস নেব সুমন্তদা। তোমার অপমান মানে গোটা বাগবাজারের অপমান। আমি চাই তোমার শ্বশুর এরপর বলুক—জামাই জিন্দাবাদ।' সুমন্তদা ইস্প্রেসড। এতক্ষণ পর মুখে সেই পরিচিত ঝিলিক দেখা গেল। তখন সদ্য জন্মানো সন্ধ্যার চাহিদা কাটিদার দোকানের এক ভাঁড় চা। ভাঁড়ে চুমুক দিয়ে আওড়াতে লাগলাম পুঁথিগত বিদ্যে। রসালো কাহিনির অনুরাগটুকু উসকে দিয়ে আবার হল কথা শুরু। ছড়াকাটা প্রথম মিষ্টির নাম ছিল 'মতিচুর'—যা ভারতের সব থেকে প্রাচীন মিষ্টি। আদি নাম 'মুদকমোদক'। অনেকে আবার 'মুখামোদক'ও বলে। বহু বছর আগের কথা। বাংলায় তখন মল্লরাজ। শোনা যায়, বিষ্ণুপুরের এক ময়রা মতিচুরের সংশোধিত সংস্করণ বের করে মল্লভূমের রাজার কাছ থেকে 'মণ্ডল' উপাধি লাভ করেছিলেন। একেই বোধহয় বলে, উদারচরিতানাং তু বসুধৈব কুটুম্বকম্।

এবার আসা যাক 'বোঁদে'র কথায়। বিন্দু বিন্দু বৃষ্টি পুকুরের সৃষ্টি—তেমনই সুজি বা বেসন ও সবেদাগুঁড়োর খুদে গোলাবিন্দু দিয়ে রসে চুবে তৈরি হয় বোঁদে। আদি নাম 'বিন্দুক'। এর সমগোত্রীয় আর এক মিষ্টি মিহিদানা। 'মিহিদানা' নামকরণের কৃতিত্ব নাকি বর্ধমানের মহারাজার। আবিষ্কারক বলা হয় ভৈরবচন্দ্র নাগকে। ১৯০৫ সাল। বাংলার ছোটলাট লর্ড কার্জন (সস্ত্রীক) ও দু'জন হাইকোর্ট জজ বর্ধমানে সফরে আসবেন। রাজনির্দেশ এল—নতুন মিষ্টি খাইয়ে অতিথি বরণ করতে হবে। বোঁদের থেকেও ছোট দানার মিষ্টি দেখে মহারাজ বিজয়চন্দ্র বললেন, 'মিহিদানা'। আর হ্যাঁ, আরও একটা মিষ্টি ছিল মিহিদানার সঙ্গে—তা হল 'সীতাভোগ'। অনেকটা ভাতের মতো দেখতে বলে এই মিষ্টিকে ডাকা হয় সীতাভোগ নামে। সেই শুরু। কার্জনের চিত্তহরণের পর দেশে বিদেশে অনেকেই রসনাতৃপ্ত হয়েছে সীতাভোগের স্বাদে।

আবার চায়ের তেষ্টা। পাঁচ মিনিট পর চা এলে বলাও শুরু হল।

'খাজা'—এটিও আদি মিষ্টি। যার আদি নাম 'ফেণিকা'। ময়দাতে ময়াম দিয়ে তাকে মেখে, পরত পরত করে বেলে, তাকে ঘিয়ে ভেজে, ঘন চিনির রসে ফেলে শুকোলেই খাজা তৈরি। এ যে দেখি, গুণের বালাই দেখে ময়রা মরে। মুখ থেকে 'বাহ্' বেরোল সুমন্তদার। এবার? খঞ্জনের নাচ দেখে চড়ুই নাচে। হরি হরি! মিষ্টির দৌলতে একেবারে গঙ্গাস্নান। এরপর 'নিখুতি'র কথা শোনে পুণ্যবানে। সীতাভোগের সঙ্গে ঘর করে লালরঙা গোলাকার খুদে আকারের দেখতে এক ধরনের মিষ্টি। আর সাধের ঘর থেকে পৃথক হলেই সে আলাদা ভিয়ান। খুদে আকারের মিষ্টি বলে এর নাম 'নিখুতি'। নিখুতির সমগোত্রীয় মিষ্টি হল 'পান্তুয়া', 'লেডিকেনি', 'ল্যাংচা'। 'পানি তাওয়া' অর্থাৎ পাতলা রসে ডোবানো হত বলে এর নাম 'পান্তুয়া'। পান্তুয়া-পরিবারের আরও এক মিষ্টি হল গোলাপজলে ভরা 'গোলাবজামুন'। আবার পান্তুয়ার রাজসংস্করণ 'লেডিকেনি'র আবিষ্কারক ভীম নাগ (মতান্তরে হাওড়া নিবাসী দুর্লভচন্দ্র ঘোষ)। জনশ্রুতি, লেডি ক্যানিং-এর জন্মদিনে এই মিষ্টি নাগ মহাশয় আবিষ্কার করেন। সেই থেকে এই মিষ্টি নতুন নাম পায়—'লেডিকেনি'। আর 'ল্যাংচা' নিয়ে বেশ সুন্দর এক গল্প চালু আছে। কলকাত্তাইয়া দাবি, শিবলিঙ্গের আকার থেকে ল্যাংচা নামের উৎপত্তি। কিন্তু ল্যাংচার সংসার বলতে শক্তিগড়কেই বোঝায়। ওখানে ছিল হারাধন দত্তের দোকান। তাঁর দুই ভাগ্নে—রমণ দত্ত এবং ক্ষুদিরাম দত্ত। হারু দত্তের দোকানে কালনা থেকে এসে একজন প্রতিবন্ধী (ল্যাংড়া) ময়রা এই মিষ্টি প্রথম তৈরি করে। পাশের দোকানের মালিকের নাম ছিল ভুবন গুহ। তিনি এই নতুন মিষ্টির প্রেমে পড়ে মাঝেমাঝেই নাকি হাঁক দিতেন—'ল্যাংচা দে'। প্রতিবন্ধীর পরিচয় থেকেই মিষ্টি পেল নতুন এক নাম।

দামোদর শেঠ অর্ডার দিয়েছিলেন, খোঁজ নিও ঝড়িয়াতে/জিলিপির রেট কী। আমার এক বান্ধবীর কথা বলি যাকে অনায়াসেই দামোদর শেঠের মহিলা সংস্করণ বলে ডাকা যায়!

আমার প্রথম কর্মজীবন শুরু হয় একটা পাবলিশিং হাউসে। সেই কারণে সূত্রধরের নাম আন্দাজ করাটা অসম্ভব নয়—কলেজ স্ট্রিট। আমার এক অফিসতুতো বান্ধবীর কথা বলি এই প্রসঙ্গে—যাকে অনায়াসেই দামোদর শেঠের মহিলা সংস্করণ বলে ডাকা যায়! সে যাই হোক, টিফিনের সময় ওর পেটেন্ট ডায়লগ ছিল—'যা ছ'পিস জিলিপি নিয়ে আয়।' সাধে কি আর তাকে শ্রীমতী শেঠ বলে রাগাতাম! দামোদরবাবুও অর্ডার দিয়েছিলেন, 'খোঁজ নিও ঝড়িয়াতে/জিলিপির রেট কী'। শ্রীমতী শেঠও অর্ডার দিতেন। ভালোই লাগত নিয়ে আসতে। ফ্রি-তে আমার ভাগ্যেও মাঝেমধ্যে জুটে যেত দু'এক পিস। একদিন হঠাৎ কেমন একটা সংস্কৃত ঘেঁষা নাম উচ্চারণ করল ও। কী যেন বেশ—কুণ্ডলিনী না কী! হ্যাঁ, শিওর কুণ্ডলিনী। ও বাবা, এ নাকি জিলিপির আদি নাম! শ্রীমতী শেঠকে আর দেখে কে সেদিন? আনন্দে ডগমগ হয়ে বলল—'গুড়ে চুপচুপ, সর্ষে হর্ষে তেলে দিলে ডুব—তবে না জমবে কুণ্ডলিনী। তার উপর যদি সামান্য যত্নের আশকারা জোটে তবে কেস জমে অমৃতি, বুঝলি ভাইপো। আজ তুই খাওয়াবি আমায়। বিনে পয়সায় আজকাল কোথাও জ্ঞানও জুটবে না।'—সুমন্তদা শুনে তো হেসে লুটোপুটি। 'হাসো, এবার আমি গজায় যাই?' হাস্যময় সায় বুঝে এগিয়ে গেলাম। 'গজা'ও খুব প্রাচীন মিষ্টি। ভালো নাম 'মণ্ড'। আবার 'জিভে গজা'কে সংস্কৃতে 'গো-জিহ্বা'ও বলা হত। গজার রাজসংস্করণ হল 'লবঙ্গলতিকা'—ভালো নাম 'কর্পূরনালিকা'।

এর পরের মিষ্টির পালা আসছে বুঝতে পেরে সুমন্তদার মেজাজি উচ্চারণ—'শুভস্য শীঘ্রম।' আবার বলার পালা। বহরমপুরের এক বিখ্যাত মিষ্টির নাম 'ছানাবড়া'। প্রাথমিক পদ্ধতি অনেকটা রসগোল্লার মতনই। ছানার জল ঝরিয়ে শুকনো করে মিহি আকারে ছেনে, হাতের নিপুণ কৌশলে তৈরি হয় লেচির মতো গোল্লা। এই গোল্লার ভিতরে থাকে মিছরি আর বড় এলাচের দানা। এরপর সেই গোলাকার ছানাকে নাড়ুপাকে পাকিয়ে ঘিয়ে ভাজা হয় ভালো করে। ভাজার প্রক্রিয়াটি সব থেকে জরুরি। বিশেষ করে উনুনে কী রকম জ্বাল হবে দেখে ছানাবড়া ভাজা হয়। তারপর সেই বড়া রসে টইটম্বুর হবে। বড়ার হৃদপিণ্ডে রস পৌঁছালেই ছানাবড়া উপাদেয়। মিষ্টি তৈরির পদ্ধতি থেকেই বোঝা যায় 'ছানাবড়া' নামকরণ সার্থক।

এবার রইল বাকি এক—'শুখো দই'। তিন রকমের দই হয়—শুখো, চলন আর দৌড় চলন। 'শুখো' হল—দুধ ঘন করে জ্বাল দিয়ে পাতা দই। ভাঁড় উপুড় করলেও 'শুখো দই' পড়বে না। একপাশ দিয়ে কেটে শেষ পাতে দিলে তো একেবারে জুড়ি মেলা ভার! চাপচাপ দেখতে। সেই জন্যই এর আর এক নাম 'কাতারি কাটা'। 'চলন' হল—দুধে জল মিশিয়ে জ্বাল দিতে হবে। জলের অংশ উড়ে যাবে। তারপর দম্বল দিয়ে পাতা হবে চলন দই। কলাপাতায় পরিবেশন করা মাত্রই এই দই অল্প অল্প চলতে থাকে। তাই 'চলন দই'। আর 'দৌড় চলন' প্রকৃতই দৌড়ায়, এক্কেবারে খাবারের পাতা ছেড়ে পালাবার চেষ্টা করে। ধর ধর করে ধরে হাপুসহুপুস লেহনের জন্য এই দই। খেয়ে তো বলতেই হয়—অমৃত বা কী পদার্থ, খেয়ে দেখি দই! এরপর কালই হয়তো সুমন্তদা ছুটবে শ্বশুরবাড়ি, 'রাজভোগ' অথবা 'কমলাভোগ'-এর কলসি হাতে ঝুলিয়ে। 'ও সুমন্তদা, শ্বশুরমশাইয়ের কাছে ফলস খেয়ে যেও না যেন—ওই মিষ্টিগুলোও রসগোল্লা-পরিবারেরই...।' ❖

ধর্ম ও জ্যোতিষ গ্রন্থের বিশাল সম্ভার

গিরিজা লাইব্রেরী ২২ সি কলেজ রো, কলকাতা - ৯ ✆ ২২৪১-৫৪৬৮/৯৬৭৪৯২১৭৫৮
Website : www.girijalibrary.com ● Email : info@girijalibrary.com

রঞ্জিত কুমার মজুমদার প্রণীত তিনটি বই—

জীবন-রঙ্গে সাধুসঙ্গে ২০০

জানা-অজানা অসাধারণ সব সাধকদের কথা, যাঁদের অনেকেই আজও দেহে রয়েছেন এবং জিজ্ঞাসু মানুষকে পথ দেখাচ্ছেন।

মৃত্যুর ওপারে ১৭৫

মৃত্যুর পর মানুষ কোথায় যায়? আত্মা কী? তা কি ফিরে ফিরে আসে? এই প্রশ্নগুলির উত্তর খুঁজতে মৃত্যু, আত্মা, পরলোকচর্চা, প্ল্যানচেট, স্পিরিট, মিডিয়াম ইত্যাদি নিয়ে লেখক গভীর অনুসন্ধান করেছেন। তিনটি অধ্যায়ে বিন্যস্ত বইটির বিষয়গুলি হল মৃত্যু ও আত্মা রহস্য, রবীন্দ্রনাথের পরলোকচর্চা এবং মৃত্যুর পরের অভিজ্ঞতা।

মহাবতার বাবাজী মহারাজের সান্নিধ্যলাভের স্বপ্নিল স্মৃতি রোমন্থন

বাবাজী মহারাজ—কলিযুগের মৃত্যুঞ্জয়ী মহাবতার ২২০

পৃথ্বীরাজ সেন প্রণীত তিনটি বই—

হাজার বছরের ভারতের সাধক-সাধিকা ৩৫০

এক অসামান্য জীবন কাহিনী

লালন ফকির : জীবন ও সাধনা ১৩০

ভারতবর্ষের সকল ধর্মের সমস্ত তীর্থস্থানের পৌরাণিক কাহিনী, মাহাত্ম্য, ঐতিহাসিক প্রেক্ষাপট এবং ভ্রমণ বৃত্তান্ত

ভারততীর্থ সমগ্র ২৫০

শ্রীরামকৃষ্ণ দেবশর্মণঃ প্রণীত

হ্লাদিনী শক্তির উৎস সন্ধানে ১৬০

সহজ-সরল এই পথে একজন অতি সাধারণ মেধার ছাত্র যেমন অসাধারণ হয়ে উঠতে পারে তেমন, মানুষ জীবনে চলার পথে নির্বিঘ্নে অতিক্রম করতে পারে সকল বাধা-বিপত্তি।

দিব্যবন্ধু প্রণীত ৩টি গ্রন্থ—

শ্বাসযোগ ও চিন্তারহস্য ১৩০

ক্রিয়াযোগ ও সিদ্ধাশ্রম ধারা ১২৫

যোগাচারে তন্ত্র সাধনা ১২০

এতে আছে : প্রাণের ক্রিয়াচার, তন্ত্রে সিদ্ধদের ক্রমস্তর, তন্ত্রসাধনায় দেহবিলাস, তন্ত্রে যুগল সাধনার মূল কথা, তন্ত্রে দীক্ষা, যোগাচারে তন্ত্রক্রিয়া, পঞ্চ-মকার রহস্য, যোগাচারে মৈথুন সাধনা, তন্ত্রসাধনায় ক্রিয়াযোগ, তন্ত্রসাধনায় মুক্তিলাভ, ষটচক্রে তন্ত্রসাধনা, ভৈরব- ভৈরবী সাধনার অন্তরীয় যোগাচার, যোগাচারে রমণ বিলাস, তন্ত্র সাধনার মূল লক্ষ্য ইত্যাদি আরও বহু বিষয়।

শ্রীশ্রীপূর্ণানন্দ ব্রহ্মচারী প্রণীত

সরল যোগ-সাধন ২২০

(পূর্ণানন্দজীকৃত ষট্চক্রের চারটি বড় রঙিন চিত্র সহ)

এই গ্রন্থে যোগ-শাস্ত্রের সুপ্রাচীন দুষ্প্রাপ্য গ্রন্থসমূহ থেকে যোগীপুরুষ গ্রন্থকার সহজ-সরলভাবে যোগ-সাধনার পদ্ধতিগত দিক নির্দেশ করেছেন।

অযাচক প্রণীত দুটি গ্রন্থ **জপ** ২০০

ওঙ্কারসাধনা ১৩০

ওঙ্কার বা প্রণব হলেন ভারতীয় অধ্যাত্ম-সাধনার কেন্দ্রবিন্দু; অথচ এঁর সম্পর্কে আমাদের অধিকাংশেরই ধারণা অস্বচ্ছ। তাই জনমানসে ওঙ্কারের সমুজ্জ্বল স্বরূপটি প্রকাশিত হয়ে উঠুক—সেই উদ্দেশ্যেই এই গ্রন্থের প্রকাশ।

গৌতম বিশ্বাস প্রণীত

পুরীর যাবতীয় তথ্যে সমৃদ্ধ সচিত্র

শ্রীক্ষেত্র পরিক্রমা ১১০

যাঁরা বহুবার পুরীধামে গিয়েছেন বইটি পেলে তাঁদের অনেকেরই মনে হতে পারে শ্রীক্ষেত্র দর্শনতো অপূর্ণই রয়ে গেছে! শ্রীশ্রীজগন্নাথদেব ও তাঁর মন্দির সম্পর্কিত এত বিচিত্র কর্মকাণ্ড, মঠ-মন্দির, সাধু-মহাত্মার স্মৃতি-বিজড়িত স্থল প্রায় কিছুইতো জানা ছিল না! পুরী ভ্রমণের ক্ষেত্রে বইটি এক নির্ভরযোগ্য পথ-প্রদর্শকের ভূমিকা গ্রহণ করতে পারে।

ডঃ অসীমবরণ দে প্রণীত

লোকনাথ-জীবনের বহু অজানা অধ্যায় সমন্বিত পূর্ণাঙ্গ জীবনী

অজানা মহাযোগী বাবা লোকনাথ ২৫০

সঞ্জয় ভুঁইয়া প্রণীত

শ্রীক্ষেত্রে সাধুসঙ্গ ৫০

পুণ্যক্ষেত্র শ্রীক্ষেত্রে রথযাত্রার শুভলগ্নে কিছু দুর্লভ সাধকের সঙ্গে সাক্ষাৎ ঘটেছিল লেখকের। তাঁদের সঙ্গে একান্ত আলাপচারিতায় যে আধ্যাত্মিক রসাস্বাদন ঘটেছিল লেখকের তা-ই এই বইয়ের প্রধান উপজীব্য বিষয়।

ডঃ ধ্যানেশ নারায়ণ চক্রবর্তী সম্পাদিত

বড় বড় হরফে দেবদেবীর স্তোত্র-ধ্যান-প্রণামমন্ত্র-গায়ত্রী-কবচ ও যন্ত্র সমন্বিত এক সুবিশাল সঙ্কলন **স্তবকবচমালা** ৪৫০

ডঃ সন্দীপন চৌধুরী প্রণীত

ভারতীয় বাস্তুশাস্ত্র ও জ্যোতিষ ২০০

বিয়েটা কেমন হবে ১২০

জ্যোতিষ শিক্ষার্থীদের জন্য গবেষণালব্ধ গ্রন্থ

ঘরে বসে ভাগ্য জানুন ১২০

যোগীন্দ্রচন্দ্র চট্টোপাধ্যায় প্রণীত প্রাচীন ও প্রামাণ্য সচিত্র গ্রন্থ

জ্যোতিষ-সমীরণ ৩৫০

সন্তোষ সরকার প্রণীত

দৈনন্দিন জীবনে ও রোগ প্রতিকারে রত্নের প্রভাব ৬০

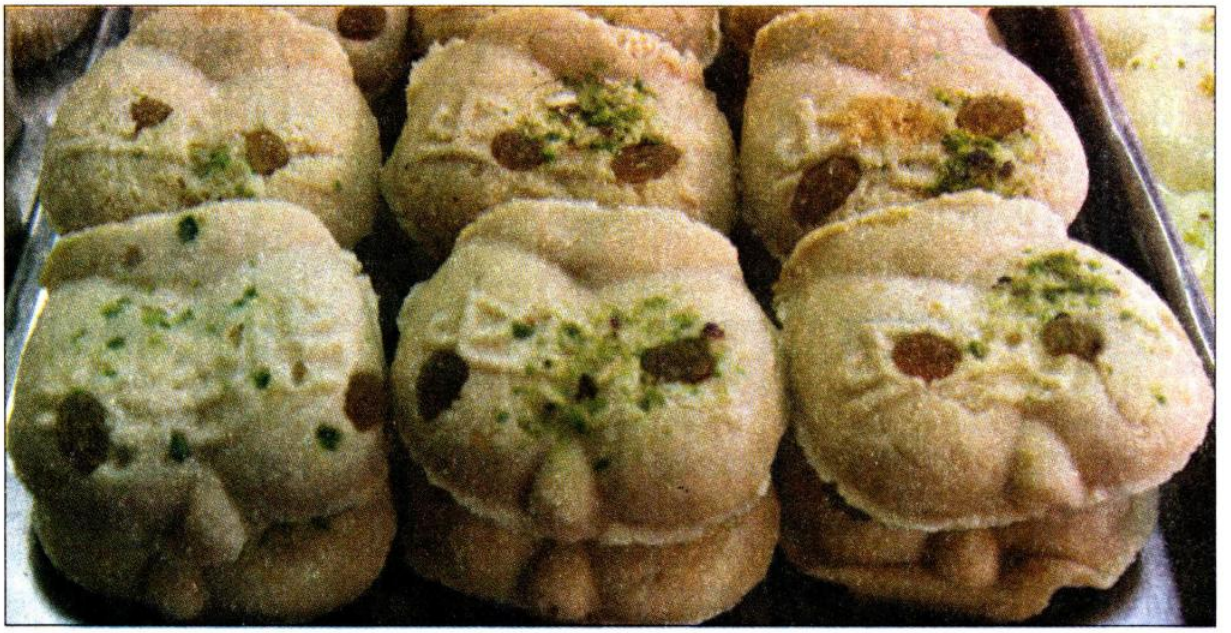

নানা মিষ্টির নানা মুখ

বাংলার ১২৯০ সাল। বিয়ের পর অষ্টমঙ্গলায় মেয়ে-জামাই আসছে জমিদার বাড়িতে। জমিদার গিন্নি তলব করলেন সূর্য মোদককে। বললেন, 'এমন মিষ্টি বানাও, বাবা জীবন যা কক্ষনো খায়নি'। বাইরেটা শুকনো। কিন্তু কামড় দিলেই মিলবে জলের সন্ধান!

নিবেদিতা দে ও বিশ্বদীপ দে

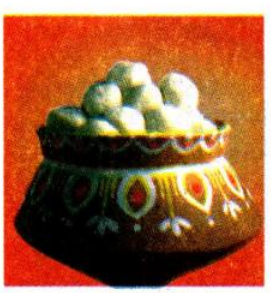

যদি কুমড়োর মতো চালে ধরি রত, পানতুয়া শত শত।
যদি সরষের মতো হত মিহিদানা, বদিয়া বুটের মতো।
যদি তরমুজের মতো হত রসগোল্লা, ধানের মতো চুষি।

শতাব্দী প্রাচীন এই গানের কলিতে মিঠাইয়ের যে রূপের সম্ভাবনার কথা বলা হয়েছে তা আসলে কবির উর্বর কল্পনা—এর মধ্যে লুকিয়ে রয়েছে মিষ্টি নিয়ে বাঙালির ফ্যান্টাসির এক চূড়ান্ত নিদর্শন। বাঙালি এভাবেই তাঁর কল্পনায় (এবং জিভের বাস্তবতায়ও বটে) মিষ্টিকে তাঁদের মনের কোণে এক চিরস্থায়ী স্থান দিয়ে রেখেছে। যেসব মিষ্টির দোকানেরও নাম জুড়ে রয়েছে সেই তালিকায়, তাদের কয়েকটিতে চোখ বোলানো যাক, যারা বাংলার মিষ্টি-মিথের বড়সড় অংশীদার।

■ চিত্তরঞ্জন মিষ্টান্ন ভান্ডার

দেশবন্ধু চিত্তরঞ্জনের স্মৃতি বিজড়িত শতবৎসর পুরোনো চিত্তরঞ্জন মিষ্টান্ন ভান্ডারের রসগোল্লার খ্যাতি প্রায় সর্বজনবিদিত। ১৯০৭ সালে দোকানের শুভারম্ভের পর থেকে শুরু করে বর্তমান হালফ্যাশানের ডায়েটিং-এর ধারণা পোষণকারী যুগেও কিন্তু রমরমিয়ে চলছে চিত্তরঞ্জন মিষ্টান্ন ভাণ্ডার। শোনা যায় ১৯৬৫ সালে ডাঃ বিধান রায়ের আমলে কলকাতায় দুধ সরবরাহ বন্ধ থাকায় এই মিষ্টি শিল্পে ভাটা পড়ে, প্রায় ১৮ মাস বন্ধ থাকে ব্যবসা। সেই আকাল কেটে যাওয়ার পর আর পিছনে ফিরে তাকাতে হয়নি তাঁদের। দোকানের একশো বছর পূর্তি উপলক্ষে এক নতুন মিষ্টান্নের আবিষ্কার করেন তাঁরা, নাম মধুপর্ক। তবে অভিনব সেই মিষ্টির স্বাদ কেমন তা লিখে জানানোর থেকে খেয়ে দেখাই ভালো। এই সংস্থার বর্তমান কর্ণধার শ্রী নিতাই ঘোষের তত্ত্বাবধানে রসগোল্লা ডট কম নামে একটি ওয়েবসাইটের উদ্বোধন করা হয়েছে। সেখানে দোকানের ইতিহাস এবং মিষ্টি সম্পর্কে বিশদ তথ্য পেতে পারেন মিষ্টি রসিকরা।

■ গিরীশচন্দ্র দে ও নকুড়চন্দ্র নন্দী

সাল ১৮৪৪, সময় উনিশ শতকের চতুর্থ দশক। ভারতবর্ষের গভর্নর স্যার হেনরি হার্ডিঞ্জের আমলে গিরীশচন্দ্র দে-র বাবা মহেশবাবু চাকরির বাজার মন্দা বুঝে নেমে পড়লেন ব্যবসায়। মানিকতলা স্ট্রিটে বাড়ির এক কোণে মহেশবাবু মিঠাইয়ের পসড়া জমিয়ে বসলেন। এরপর বাবার ব্যবসায় এলেন

নবকৃষ্ণ গুঁই-এর বিখ্যাত ঘিপোয়া মেদিনীপুরের ভোগপুর নামে একটি গ্রামে গিয়ে দীনেন্দ্রনাথ দে আবিষ্কার করেন। সেখানে এই ঘিপোয়া তেলে ভাজা হত না, শুধুমাত্র উনুনে সেঁকে খাওয়া হত। প্রায় দুশো বছর পুরোনো নবকৃষ্ণ গুঁই-এর মিষ্টান্ন এতই সুস্বাদু, শোনা যায় বউবাজারের জগন্নাথের রথ দোকানের সামনে দাঁড়িয়ে যায় নবকৃষ্ণের ছানার পায়েসের লোভ সামলাতে না পেরে! সেই থেকে আজও রথের সময় ছানার পায়েস করে নবকৃষ্ণ গুঁই নিজের ঐতিহ্য বজায় রেখেছে।

গিরীশবাবু। তাঁর দক্ষ হাতের ছোঁয়ায় দিনে দিনে খ্যাতি বাড়তে লাগল দোকানের। কিছুদিন পর গিরীশবাবু তাঁর কন্যার সঙ্গে নকুড়চন্দ্র নন্দীর চার হাত এক করলেন, মিলনবাঁশি বাজল। এরপর মৃত্যুশয্যায় গিরীশবাবুর পা ছুঁয়ে নকুড়চন্দ্র নন্দী অঙ্গীকারবদ্ধ হলেন। সেই সময় থেকেই দোকানের নাম হল গিরীশচন্দ্র দে ও নকুড় চন্দ্র নন্দী। সেই থেকে আজ পর্যন্ত রমরমিয়ে চলছে এই মিষ্টির দোকান। এখন দোকানের উত্তরাধিকার সামলাচ্ছেন নন্দী পরিবারের চতুর্থ পুরুষ প্রতীপ নন্দী। সেই ইংরেজ আমল থেকে দোকানের শুভারম্ভ, তারপর থেকে প্রতীপ নন্দীর আমলেও একই ভাবে ব্যবসার খ্যাতি রয়ে গেছে, বরং শ্রীবৃদ্ধি হয়েছে, দেশ-বিদেশে ছড়িয়ে পড়েছে নকুড়ের খ্যাতি। নকুড়ের মিষ্টির নাম কলকাতার কে না জানে! গত বছর ইডেনে কেকেআর-এর জয় উপলক্ষে যে বিশাল আয়োজন হয়েছিল সেখানে নকুড়ের তৈরি ছানার কেক কেটেছিলেন 'বাদশা' শাহরুখ খান! প্রতীপ নন্দী জানালেন 'ছোটা বচ্চনের বিয়েতে ঋতুপর্ণ ঘোষের সুপারিশে মুম্বাইয়ে গিয়েছে আমাদের পারিজাত সন্দেশ।' এছাড়াও নকুড়ের বহু বিখ্যাত মিষ্টি আছে। যেমন বাবু সন্দেশ কিংবা জামাই ষষ্ঠির সময় জামাই স্পেশাল সিঙারা। এই সিঙারা আমাদের চেনা তরকারির পুরের সিঙারা থেকে একেবারে আলাদা। সব রকমের ফল, বাদাম, কিসমিস দিয়ে তৈরি করা হয় সিঙারা। বিভিন্ন মশলা, গরমমশলা, পোস্ত দিয়ে তৈরি চপ সন্দেশ। আহা সে যে কী সুস্বাদু, না খেলে বোঝানো অসম্ভব। প্রতীপবাবু জানিয়েছেন বাঙালির অন্যতম শ্রেষ্ঠ অনুষ্ঠান পয়লা বৈশাখ। আর বাঙালির এই প্রাণের অনুষ্ঠানে প্রায় কুড়ি থেকে আঠাশ রকমের সন্দেশ তৈরি করা হবে এখানে। এর মধ্যে অরেঞ্জ, ম্যাঙ্গো, কিউই, আম্রোপালি, দিলখুস, স্ট্রবেরি, চকোলেটের ভিন্ন স্বাদের সন্দেশ পাওয়া যাবে। 'ফ্রুট ফ্লেভারের এই সন্দেশগুলিতে কোনও প্রকার রং ব্যবহার করা হয় না। ব্যবহার করা হয় ফলের রস, স্কোয়াশ।' এমনটাই জানিয়েছেন প্রতীপবাবু। নকুড়ের মিষ্টির চাহিদা সম্পর্কে বলতে গিয়ে প্রতীপবাবু বলেছেন বাঙালি তো বটেই, গুজরাটি, পাঞ্জাবি, দক্ষিণ ভারতীয়, এমনকী বিদেশিদের মধ্যেও নকুড়ের মিষ্টির চাহিদা ব্যপক।

■ নবীনচন্দ্র দাশ ও কেসি দাশ

'বাগবাজারের নবীন দাশ/ রসগোল্লার কলম্বাস।' বাংলার বাইরে বাঙালির প্রতিনিধিত্ব করে যে সমস্ত আইকন, তাদের অন্যতম রসগোল্লা। আর রসগোল্লার শ্রেষ্ঠ কারিগর বলতে সারা বিশ্বের কাছে পরিচিত এই দুটি নাম—নবীনচন্দ্র দাশ এবং কেসি দাশ। ১৮৬৪ সালে মিষ্টির দোকান করেছিলেন নবীনচন্দ্র দাশ। বিখ্যাত কাঠের ব্যবসায়ী ভগবানদাস বগলা নামে এক মাড়োয়ারি পরিবারের জলতেষ্টা মেটাতে গিয়ে নবীন ময়রা জলের সঙ্গে এগিয়ে দিয়েছিলেন রসে ডোবানো ছানার গোলক। এভাবেই হঠাৎ আবিষ্কৃত হয় 'রসগোল্লা'। তারপরে আর কখনও পিছনে ফিরে তাকাতে হয়নি এই মিষ্টি এবং তার আবিষ্কর্তাকে। বর্তমানে কলকাতার পাঁচটি দোকান ছাড়াও ভারতবর্ষের অন্যত্রও পাওয়া যায়। শুধু বেঙ্গালুরুতেই রয়েছে সতেরোটি দোকান। আর 'নবীনচন্দ্র দাশ' এই নামের মাহাত্ম্য বহন করছে রাজবল্লভ পাড়া।

■ নবকৃষ্ণ গুঁই

দোলের সময় নবকৃষ্ণ গুঁই-এর ঘিপোয়ার কথা বেনে পাড়ার কে না জানে! চালের গুঁড়ো আর আখের গুড় দিয়ে তৈরি অসাধারণ এই আইটেমের সৃষ্টিকর্তা দীনেন্দ্রনাথ দে। তিনি নতুন নতুন খাবার তৈরি করতে আগ্রহী ছিলেন। নবকৃষ্ণ গুঁই-এর বিখ্যাত ঘিপোয়া মেদিনীপুরের ভোগপুর নামে একটি গ্রামে গিয়ে দীনেন্দ্রনাথ দে আবিষ্কার করেন। সেখানে এই ঘিপোয়া তেলে ভাজা হত না, শুধুমাত্র উনুনে সেঁকে খাওয়া হত। প্রায় দুশো বছর পুরোনো নবকৃষ্ণ গুঁই-এর মিষ্টান্ন এতই সুস্বাদু, শোনা যায় বউবাজারের জগন্নাথের রথ দোকানের সামনে দাঁড়িয়ে যায় নবকৃষ্ণের ছানার পায়েসের লোভ সামলাতে না পেরে! সেই থেকে আজও রথের সময় ছানার পায়েস করে নবকৃষ্ণ গুঁই নিজের ঐতিহ্য বজায় রেখেছে। এছাড়া এই দোকানের অন্যতম কলাইডালের রামবোঁদে, যা একমাত্র এখানেই মেলে। আর আছে ছানার মুড়কি, ভিক্টোরিয়া, নেহেরু সন্দেশ। এখানে প্রায় ষাট রকমের মিষ্টির আইটেম পাওয়া যায়। দোকানের কর্ণধারের কথায় 'বেনে পাড়ায়, বেনেদের চাহিদা আমরা মিষ্টি তৈরি করার চেষ্টা করি।'

■ ভীম চন্দ্র নাগ

চাঁপাতলার শীতলামায়ের পুজো খুবই বিখ্যাত। শোনা যায় ভীম নাগের দোকান থেকে মা নাকি সন্দেশ চেয়ে খেয়েছিলেন। সেই থেকে ভীম নাগের দোকান থেকেই মায়ের পুজোর সন্দেশ যায়। এই পুজো 'ষোলোআনার পুজো' নামে খ্যাত। প্রতি বছর চৈত্র মাসে শীতলা পুজোর সময় হাজারে হাজারে প্রসাদের প্যাকেট তৈরি হয় দোকানে। দু'শো বছরের পুরোনো এই দোকানের মিষ্টি বহু বিখ্যাত বাঙালির প্রিয় ছিল। মিষ্টির জগতে বিখ্যাত 'লেডিকেনির' প্রতিষ্ঠাতাও কিন্তু ভীম চন্দ্র নাগ। লর্ড ক্যানিং-এর বউয়ের জন্মদিন উপলক্ষে আশুতোষ নাগ সেই পুরাকালে তৈরি করেছিলেন লেডিকেনি। আবার শ্রী রামকৃষ্ণ দেবও ভীম নাগের মিষ্টির ভক্ত ছিলেন। এদের রসমাধুরী, পুজো স্পেশাল চন্দ্রপুলি, রোজক্রিম, আবার খাবো, দিলখুস, শকুন্তলা সন্দেশ এত বছর পরও বাঙালির আবেগের সঙ্গে মিশে আছে।

■ সেন মহাশয়

১৮৮৫ সালে দর্জিপাড়ার শ্রীআশুতোষ সেন, 'সেন মহাশয়'-এর প্রতিষ্ঠাতা। ফড়িয়াপুকুরের সেনমহাশয় বাঙালির আবেগের সঙ্গে আজও একই ভাবে জড়িয়ে। শোনা যায় এই ফড়িয়াপুকুর থেকেই মোহনবাগান অ্যাথলেটিক ক্লাবের যাত্রা শুরু হয়। আবার জাতীয়তাবাদী উন্মাদনার সঙ্গেও অবিচ্ছেদ্য ভাবে যুক্ত ফড়িয়াপুকুর। ফড়িয়াপুকুর ছাড়াও সেনমহাশয়ের শাখা কলকাতার অনান্য চত্বর যেমন ভবানীপুর, গড়িয়াহাট, লেকমার্কেটেও স্বমহিমায় বিরাজমান। সেন মহাশয়ের বর্তমান কর্ণধার চতুর্থ প্রজন্মের শ্রীসন্দীপ সেন। সেন মহাশয়ের

প্রায় একশো সত্তর বছর আগে শহরে ঘাঁটি গাড়েন নলিনবাবু। রাজা রাজেন্দ্র মল্লিকের অনুগ্রহে নতুন বাজারে টালির ছাউনির তলায় শুরু করেন দোকান।

'গোলাপি প্যাঁড়া' আজও বাঙালির পরম প্রিয়। কোয়ালিটির দিক থেকে সেনমহাশয় এই দুর্মূল্যের বাজারেও নিজেদের অস্তিত্ব সমানভাবে বজায় রেখেছে। এছাড়া এখানকার ক্ষীর পুলি, মনমাতানো, বাদশাহী, মনোহরা সন্দেশ, কাজুবাদাম আর ছানা সহযোগে তৈরি হলুদ কেকের আবেদন আজও সবার শীর্ষে।

■ দ্বারিক ঘোষ

স্বয়ং রবীন্দ্রনাথ অবধি স্বীকার করেছিলেন বাংলার রসস্রষ্টা মাত্র দু'জন। একজন তিনি নিজে, অন্যজন দ্বারিক ময়রা। এন্টালি, বেহালা ও শ্যামবাজারের দ্বারিক ঘোষের 'জলভরা সন্দেশ' বাঙালিকে নতুন করে চেনাবার প্রয়োজন আছে কি? সেই ১৮৮৫ সালে দোকানের আর্বিভাবের পর থেকে আজ পর্যন্ত সমান ভাবে জনপ্রিয় দ্বারিক ঘোষের মিষ্টি। প্রায় ১৭টি দোকান সারা কলকাতা জুড়ে থাকলেও প্রথম প্রতিষ্ঠান কিন্তু বাগবাজারের বাটার জুতোর দোকানের কাছে। দোকানের বর্তমান কর্ণধার চতুর্থ প্রজন্মের পার্থপ্রতিম ঘোষ। দুর্গা পুজোর সময় থেকে দ্বারিক ঘোষের শো কেসে শোভা পায় বেশ কিছু রকমের এক্সপেরিমেন্টাল মিষ্টির আইটেম। এছাড়া রোজক্রিম, কেক সন্দেশ, রাবরি, প্রাণহরা, ক্ষীরের মালপো তো রয়েছেই।

■ বলরাম মল্লিক অ্যান্ড রাধারমণ মল্লিক

একশো বছরের পুরোনো কলকাতার মিষ্টির দোকানগুলির ইতিহাসের সঙ্গে বলরাম মল্লিকের দোকান প্রতিষ্ঠার কাহিনি কিছুটা আলাদা। বলরামবাবু মিষ্টির কারিগর হওয়ার স্বপ্ন নিয়ে কলকাতায় পাড়ি দেন। হুগলির কোন্নগরের বাসিন্দা বলরাম মল্লিকের বয়স তখন সবে কুড়ি। এই বয়সেই মিষ্টি তৈরির অদম্য ইচ্ছা নিয়ে উত্তর কলকাতার এক মিষ্টির দোকানে যোগ দেন। নিজে কাজ শিখে যথেষ্ট যোগ্যতার সঙ্গে মিষ্টির দোকান খুললেন ভবানীপুরে। উনিশ শতকের গোড়ার কথা, সে সময় কলকাতার খ্যাতি সম্পন্ন হরলালকারের পরিবারের কাছ থেকে ভাড়া নিয়ে দোকানের শুভারম্ভ হয়। বর্তমানে ভবানীপুর ছাড়াও বালিগঞ্জ, পার্কস্ট্রিট, ইএম বাইপাস ও কসবাতে রয়েছে বলরাম মল্লিকের শাখা। বলরাম মল্লিকের তৈরি কড়া পাক, নরম পাক, নলেন গুড়ের সন্দেশ... আহা! এছাড়া ক্ষীরের দই অমৃতপয়োধি, ঘিয়ে ভাজা রাম বোঁদে, বিভিন্ন ধরনের সন্দেশ,যার মধ্যে বিখ্যাত চকোলেটের বিভিন্ন আইটেম তো রয়েছেই বাঙালিদের রস বাসনা তৃপ্ত করতে।

■ নলিন চন্দ্র দাস অ্যান্ড সন্স

বর্ধমান জেলার খণ্ডপুর থানা এলাকার বাসিন্দা নলিন চন্দ্র দাস। বর্তমান কর্ণধার তপন দাসের কাছ থেকে জানা গেল, প্রায় একশো সত্তর বছর আগে হিন্দু-মুসলমানের রায়টের কারণে রুজি রোজগারের আশায় শহরে ঘাঁটি গাড়েন নলিনবাবু। হাটে বাজারে ফেরি করে বেড়াতেন মিষ্টান্ন। পরে রাজা রাজেন্দ্র মল্লিকের অনুগ্রহে নতুন বাজারে টালির ছাউনির তলায় শুরু করেন দোকান। খুব দ্রুত বাড়তে থাকে জনপ্রিয়তা। রবীন্দ্রনাথ থেকে বিধান চন্দ্র রায়—এই দোকানের কদর ছিল না কার কাছে! ক্যাডবেরি সন্দেশের জনক নলিন চন্দ্র দাস। নতুন বাজারের বিখ্যাত মন্মথ নাথ ঘোষের স্ত্রী বউ রানিমার একান্ত ইচ্ছায় এই সন্দেশ বানান নলিনবাবু। বিভিন্ন স্বাদের আইসক্রিম সন্দেশ, আম সন্দেশ, ব্ল্যাক কারেন্ট, রোজ ক্রিম, আবার খাব, দিলখুশ—এমন শতাধিক আইটেম পাওয়া যাবে এখানে। পয়লা বৈশাখ উপলক্ষ্যে মিলবে '১৪২০ শুভ হোক' নামে একটি নতুন আইটেম। পাওয়া যাবে কেশর স্ট্রবেরি, চকোলেট ভ্যানিলা—দু'রকমের ফ্লেভারে। এ ছাড়া স্বামী বিবেকানন্দের ১৫০ বছর পূর্তি উপলক্ষে 'কল্পতরু' নামে একটি নতুন সন্দেশও তৈরি করা হচ্ছে। বর্তমানে নতুনবাজার

একশো বছরের পুরোনো কলকাতার মিষ্টির দোকানগুলির ইতিহাসের সঙ্গে বলরাম মল্লিকের দোকান প্রতিষ্ঠার কাহিনি কিছুটা আলাদা। বলরামবাবু মিষ্টির কারিগর হওয়ার স্বপ্ন নিয়ে কলকাতায় পাড়ি দেন। হুগলির কোন্নগরের বাসিন্দা বলরাম মল্লিকের বয়স তখন সবে কুড়ি। এই বয়সেই মিষ্টি তৈরির অদম্য ইচ্ছা নিয়ে উত্তর কলকাতার এক মিষ্টির দোকানে যোগ দেন। নিজে কাজ শিখে যথেষ্ট যোগ্যতার সঙ্গে মিষ্টির দোকান খুললেন ভবানীপুরে।

ছাড়াও এঁদের কলকাতার আরও তিন জায়গায় শাখা রয়েছে।

■ নিউ আশীর্বাদ সুইটস

বালিগঞ্জ স্টেশনের পাশে অবস্থিত এই দোকানের 'আম দই'-এর খ্যাতি সর্বজনবিদিত। উপভোগ্য এই 'আম দই'-এর স্বাদ কেমন, তা লিখে বোঝানো অসম্ভব। আপনাকে আসতেই হবে এমন অনুপম স্বাদের সাক্ষী হতে নিউ আশীর্বাদ সুইটস-এ। সঙ্গে রয়েছে আরও রকমারি স্বাদের মিষ্টি। সব মিলিয়ে জমজমাট এই মিষ্টি মজলিসে আপনাকে আমন্ত্রণ।

■ সূর্য মোদক

বাংলার ১২৯০ সাল। বিয়ের পর অষ্টমঙ্গলায় মেয়ে-জামাই আসছে জমিদার বাড়িতে। সাজো সাজো রব। জমিদার গিন্নি তলব করলেন অঞ্চলের সেরা ময়রা সূর্য মোদককে। বললেন, 'এমন মিষ্টি বানাও, বাবা জীবন যা কক্ষনো খায়নি'। সেই নতুন মিষ্টির গড়ন কেমন হবে তাও বলে দিলেন জমিদার গিন্নি। বাইরেটা শুকনো সন্দেশের মতো। কিন্তু কামড় দিলেই মিলবে জলের সন্ধান! ময়রার কপালে ভাঁজ। শুরু হল চেষ্টা। কিছুতেই তেমন মিষ্টি তৈরি করা যাচ্ছিল না। শেষে অনেক পরিশ্রম ও কায়দাকানুনের পরে এল সাফল্য। মিষ্টি মুখে দিয়ে জমিদার গিন্নি আহ্লাদিত। পরে নতুন জামাইও। ঘটল ছোট্ট এক কেলেঙ্কারিও। সন্দেশে কামড় দিতেই রসে ভিজে গেল জামাইয়ের নতুন গরদের পাঞ্জাবিটি। তার তো জানা ছিল না এই নতুন মিষ্টির গুপ্ত রহস্য! সেই শুরু। 'জলভরা' ও 'সূর্য মোদক' এই দুই নাম আজও খ্যাতির শীর্ষে। এখনও বহু দূর থেকে মিষ্টিলোভী মানুষ এখানে ছুটে আসেন। ঐতিহ্যমণ্ডিত দোকানটিতে বংশানুক্রমে দুধ জোগাচ্ছেন একই বংশোদ্ভূত গোয়ালা। 'জলভরা'-র পাশাপাশি এই দোকানের 'ক্ষীরপুলি'র খ্যাতি প্রবল। বিশেষত শীতকালে, নলেন গুড়ের সময়ে। সঙ্গে নলেন গুড়ের 'কাঁচাগোল্লা' নতুন প্রজন্মকে টানতে সন্দেশের পাকের সঙ্গে ফ্রুট জুস মিশিয়ে সন্দেশ তৈরি করা হয়। সূর্য মোদকের প্রপৌত্র শরদিন্দু মোদকের দাবি ফাস্টফুডের এই তুমুল জনপ্রিয়তার যুগেও তাঁদের দোকানের মিষ্টির সন্ধানে আজও ভিড় জমান আট থেকে আশি—সকলেই।

■ ফেলু মোদক

'এই দোকান কত পুরোনো? মৃদু হাসলেন বৈদ্যনাথ দে (মোদক) 'তখনও জিটি রোড মাটির। জিটি রোড পাকা হয়েছে ১৫৮ বছর আগে। তারও বেশ কিছুদিন আগে তৈরি হয়েছিল এই দোকান। সে সময় এখানে রীতিমতো জঙ্গল!' এত বছর পেরিয়েও বিন্দুমাত্র ভাটা পড়েনি ফেলু মোদকের জনপ্রিয়তায়। গুণগত মান যেন এতটুকু টা না খায় সে ব্যাপারে তারা সদাসতর্ক। 'যারা দুধ, ছানা এ সব জোগান দেয় তারা সবাই স্থানীয়। বংশ পরম্পরায় তারা এই দোকানে আসছে। ধরুন, যে এখন দিচ্ছে, তার দাদু-বাবা এরাও দিয়েছে।' কিন্তু শুধু ঐতিহ্য আঁকড়েই পড়ে নেই তাঁরা এখন যন্ত্রের সাহয্যে তৈরি করা হচ্ছে মিষ্টি। যাতে আকার সব সমান হয়। স্বাদ হয় আরও ভাল। পাশাপাশি তা যেন হয় স্বাস্থ্যসম্মত। মানুষ যে এখন ক্যালরি সচেতন সে সম্পর্কে যথেষ্ট ওয়াকিবহাল ফেলু মোদকের বর্তমান বংশধরেরা।

নতুন যুগের সঙ্গে তাল মিলিয়ে চলেন তাঁরা। তাই তো স্বয়ং মুখ্যমন্ত্রীরও বেজায় পছন্দ তাঁদের মিষ্টি। বিভিন্ন সরকারি কাজে এখান থেকেই মিষ্টি নেওয়া হয়। সম্প্রতি নতুন রাষ্ট্রপতি প্রণব মুখোপাধ্যায়কে সম্বর্ধনার সময়ও এখান থেকেই মিষ্টি গিয়েছিল। 'বাংলার মিষ্টির কদর তো শুধু বাংলায় নয়। তার বাইরেও এর কদর কোনওদিনই কমবে না। বরং তা আরও বাড়বে বলেই আমার বিশ্বাস।' প্রবল প্রত্যয়ের সঙ্গে এ কথা জানালেন বাংলার মিষ্টির নতুন দিগন্ত ছোঁয়ার স্বপ্নে বিভোর ফেলু মোদকের অন্যতম কর্নধার বৈদ্যনাথবাবু।

■ কৃষ্ণনগরের সরভাজা ও সরপুরিয়া

মাটির পুতুল নাকি সরভাজা, সরপুরিয়া? কৃষ্ণনগরের প্রধান আকর্ষণ কী তা নিয়ে রীতিমতো তর্ক চলতে

পারে। কোনও সন্দেহ নেই সরভাজার পক্ষে বড়সড় ভোট পড়বে। কত জিনিসের খ্যাতি তুঙ্গে উঠল, কত জিনিসের খ্যাতি পড়ে গেল। কিন্তু একশো বছর পেরিয়ে এসে আজও এর ইউএসপি আকাশ ছোঁয়া। পাশাপাশি বিখ্যাত হয়ে রয়েছে অধরচন্দ্র দাসের নামও। যাঁর সৃষ্টিশৈলিতেই বিখ্যাত হয়েছে এই সরভাজা।

■ বর্ধমানের সীতাভোগ/মিহিদানা

সুকুমার রায়ের 'চীনে পটকা' মনে পড়ে? রামপদ হাঁড়িতে করে মিহিদানা নিয়ে এলে তা নিয়ে যা গণ্ডগোল বেধেছিল তা সকলেরই জানা। 'মিহিদানা' নামকরণের কৃতিত্ব বর্ধমানের মহারাজার। আবিষ্কারক সম্ভবত ভৈরবচন্দ্র নাগ। 'মিহিদানা'-র সঙ্গে আত্মীয়তা রয়েছে 'সীতাভোগ'-এর। দেখতে অনেকটা ভাতের মতো বলে 'সীতাভোগ' নাম হয়েছিল। বর্ধমানেই এই দুটি পরম লোভনীয় বস্তুর সেরা ঠিকানা। মিষ্টিপাগল বাঙালির অন্যতম সেরা ঠিকানা তাই বর্ধমান।

■ শক্তিগড়ের ল্যাংচা

'বাসনার সেরা বাসা রসনায়'। আর রসনার সেরা বাসা? সে কি ল্যাংচায়? শক্তিগড়ে এলে মনে হতে পারে এমনটাই। দু'পাশে কেবল ল্যাংচারই দোকান। কত রকম নামের সঙ্গে যে ল্যাংচাকে জড়িয়ে ফেলা হয়েছে তার ইয়ত্তা নেই। 'ল্যাংচা এম্পোরিয়াম', 'ল্যাংচা মহল', 'ল্যাংচা ধাম'—ক'টা নাম করব? মনে হতেই পারে মিষ্টি বলতে কি ল্যাংচাই? সাধে কি আর এ অঞ্চলের নামেই 'ল্যাংচা' বস্তুটির এমন অচ্ছেদ্য সংযোগ তৈরি হয়েছে!

আপনি যদি মিষ্টি-বিলাসী হন, তবে আপনার মিষ্টি-বিহার অসমাপ্ত থেকে যাবে শক্তিগড়ে না এলে। ❖

ডাক্তার ও চিত্রকর

সুব্রত বন্দ্যোপাধ্যায়

নাহ্। আজ আদিত্যনারায়ণের হিসেবে একটা গণ্ডগোল হয়ে গেছে। বিকেল থেকেই আকাশের মুখ ভার। অন্যদিন ডায়মন্ডহারবারের আকাশকে উজ্জ্বল লাল রঙে রাঙিয়ে সূর্য পশ্চিমে ঢলে পড়ে। আজ বিকেলের শেষে মেটে রঙের চাপা আলোয় চারপাশে থমথমে ভাব। পাখিরা বোধহয় ঝড়জলের আভাস আগে পায়। অন্যদিনের চেয়ে কিচিরমিচির আওয়াজ তাই অনেক বেশি। হয়তো সতর্ক করছে, জোর বৃষ্টি এল বলে। সময় থাকতে থাকতে আশ্রয়ের নিশ্চিন্ত ঘেরাটোপে চলে যাব।

আদিত্য ভেবেছিলেন ডায়মন্ডহারবারে তাঁর নিবাস 'নিরালা' থেকে সন্ধে ছ'টা নাগাদ বেরিয়ে আটটার সময় গোলপার্কে নিজের ফ্ল্যাটে পৌঁছে যাবেন। অন্য রবিবার সন্ধে সাতটা সাড়ে সাতটার আগে 'নিরালা' থেকে বেরোন না। কিন্তু আজ আকাশের যা রকমসকম আগে বেরোনোই ভালো।

আদিত্যনারায়ণ সেন লব্ধপ্রতিষ্ঠ গাইনোকোলজিস্ট। রাসবিহারী অ্যাভিনিউতে তাঁর বিশাল নার্সিংহোম। সব কিছু নিজে হাতে তিলতিল করে গড়ে তুলেছেন। অথচ বছর তিরিশ আগে যখন ওয়েস্ট বেঙ্গল হেলথ সার্ভিসে ইস্তফা দিয়ে নিজস্ব প্র্যাকটিস শুরু করেন তাঁর আত্মীয়, পরিজন, বন্ধুবান্ধবরা হায় হায় করেছিল। নেহাত খেপে না উঠলে কেউ সরকারি চাকরির নিশ্চিত এবং নিরাপদ আশ্রয় ছেড়ে দুর্গম পথে পা বাড়ায়! তবে আদিত্যনারায়ণের দুটি জিনিস ছিল। জেদ এবং লক্ষ্যে অবিচল থাকার নিষ্ঠা। চাকরি করতে করতেই মনে হত এমন সাদামাটা নিস্তরঙ্গ

জীবন তাঁর জন্য নয়। একটাই জীবন, অনেক কিছু করার আছে। এখন তিরিশ বছর পর অ্যাপেলো রিপ্রোডাকটিভ রিসার্চ সেন্টারের বার্ষিক লেনদেন একশো কোটি ছাড়িয়ে গেছে। সংস্থাটি তীব্রবেগে উন্নতির সিঁড়ি অনায়াসে পেরিয়ে চলেছে।

সরিষার মোড় থেকে ঝেঁপে বৃষ্টি এল। আকাশে শেষ বিকেলের আলো নিভে এসেছিল, এই প্রবল বৃষ্টি সেই মরা আলো শুষে নিয়ে ধূসর আঁধারের পর্দায় ঢেকে দিল চারপাশের প্রকৃতি। এদিকের রাস্তাঘাটে জোর আলো নেই। যা দু-একটা আছে জলের তোড় এবং ঘনায়মান অন্ধকারে সেগুলো না থাকার মতো হয়ে গেল।

গাড়ির ওয়াইপার ক্রমাগত চালিয়েও জলের দাগ সামনের কাচ থেকে মোছা সম্ভব হচ্ছে না। বৃষ্টির ছাঁটে কুয়াশার মতো বাতাবরণ তৈরি হয়েছে। সামনের রাস্তায় পাঁচ ফুটের পর থেকে কিছু দেখা যাচ্ছে না। হেডলাইট জ্বেলে ধীরে ধীরে গাড়ি চালাতে চালাতে ডাক্তার সেন রাস্তার দু'ধারে নজর করতে থাকেন। যদি কোনও বাড়ি চোখে পড়ে তবে গাড়ি থেকে নেমে সেখানে আশ্রয়ের চেষ্টা করা যেতে পারে। এখন তাঁর এমন কিছু তাড়া নেই। নার্সিংহোমে তাঁর কাজ আগামিকাল সকাল থেকে শুরু হবে। তাছাড়া দায়দায়িত্ব সুষ্ঠুভাবে বিন্যস্ত করা আছে। তিনি দু-চার দিন না থাকলে কিছু যায় আসে না।

বিষ্ণুপুর মোড় আসার কিছু আগে রাস্তার বাঁদিকে এবং বড় বাড়িতে আদিত্যনারায়ণের চোখ আটকায়। জায়গাটা এই দুর্যোগে আশ্রয় নেওয়ার জন্য যথেষ্ট ভালো। আর সবচেয়ে সুবিধে বিশাল বাড়িটির সর্বাঙ্গে বয়সের ছাপ এবং ছোবল থাকলেও সামনে বেশ খানিকটা ফাঁকা জায়গা আছে যা এই স্যান্ট্রোর মতো তিনটে গাড়ি রাখার পক্ষে যথেষ্ট।

বাড়ির সামনে গাড়ি পার্ক করার সময়ে হেডলাইটের তীব্র আলোয় তাঁর নজরে আসে গাড়িবারান্দার স্থানে স্থানে জাফরি ভেঙে ভেতরের লোহার কঙ্কাল বেরিয়ে এসেছে। হেডলাইট নিভিয়ে আদিত্য বেশ জোরে স্যান্ট্রোর দরজা বন্ধ করলেন। এই আওয়াজে সচকিত হয়ে যদি বাড়ির লোকজন বাইরে বেরিয়ে আসে তবে তাঁকে আর অহেতুক ডাকাডাকি করতে হয় না।

কিন্তু কোনও কাজ হয় না। দরজা বন্ধের আওয়াজে দু-একটা চামচিকে শুধু ফটফট করে নিজেদের অস্তিত্ব জানান দিয়ে ফের গোপন আস্থানায় সেঁটিয়ে যায়। অন্ধকারে কিছুক্ষণ দাঁড়িয়ে দৃষ্টি অভ্যস্ত হতে ডাক্তার দেখেন বিরাট সদর দরজা কেবল ভেজানো। হাওয়ার দাপটে ভারী দরজা খানিক ফাঁক হয়েছে। তিনি ব্যাগ থেকে টর্চ বের করে সদর ঠেলে ভেতরে ঢোকেন।

সদরের পর ঠাকুরদালান। সেখানে পায়রার বিষ্ঠায় মেঝেতে পা রাখা দায়। এদিন ওদিক টর্চ ঘুরিয়ে কী করা যায় ভাবছেন এমন সময়ে খুব কাছে ভয়ঙ্কর শব্দে বাজ পড়ল। আলোর তীব্র ছটায় দোতলার সিঁড়ি চোখে পড়ে। এই ঠাকুরদালানে দু-এক ঘন্টা দিব্যি কাটিয়ে দেওয়া যেত কিন্তু কী এক তীব্র আকর্ষণে আদিত্যনারায়ণ সিঁড়িতে উঠতে থাকেন। এই প্রথম তিনি এই বাড়িতে পা রাখছেন অথচ মনে হচ্ছে যেন খুব পরিচিত এই স্থান। এখানে তিনি আগে এসেছেন। দোতলায় টানা লম্বা বারান্দা। বাইরের দিকে লোহার নকশা কাটা রেলিঙের উপর কাঠের হ্যান্ডেল বসানো। বিদ্যুতের নীল শিখায় সমস্ত বাড়িটা মুহূর্তে চোখের সামনে ভেসে উঠে মিলিয়ে যাচ্ছে। জলের তোড় আরও বেড়েছে। বারান্দা পেরিয়ে প্রথম ঘরটি বন্ধ। আরও এগিয়ে দ্বিতীয় ঘরের দরজা ঠেলতে খুলে গেল। আর কি এগোনো উচিত হবে? আশ্রয়ের সন্ধানে এসে বিপদে পড়ে যাবেন না তো? পরক্ষণে মনে হয়, না এই চেনা বাড়িতে তাঁর কোনও বিপদ হবে না। কিন্তু এখানে তো তিনি কখনও আসেননি। তবে কেন চেনা মনে হচ্ছে! খোলা দরজা দিয়ে এগিয়ে সামনে করিডর পেরিয়ে বাঁদিকে ফের দরজা, সেখানে দাঁড়িয়ে কেশে গলা পরিষ্কার করে আদিত্য বলেন, কেউ আছেন?

বার তিনেক বলার পর হ্যারিকেন হাতে এক বৃদ্ধকে দেখা যায়। তিনি আদিত্যর সামনে এসে আলো উঁচু করে তুলে ধরে নিরীক্ষণ করে বলেন, কী ব্যাপার? এখানে কেউ তো আসে না।

সরাসরি এমন প্রশ্নে অস্বস্তি হলেও তা গোপন রেখে আদিত্য উত্তর দেন, প্রবল ঝড় জলে গাড়ি চালাতে ভরসা হচ্ছিল না। সেই সময়ে এই বাড়িটা দেখে ঢুকে পড়েছি। নিশ্চিন্তে থাকুন, জল থামলেই চলে যাব।

এখন উদ্বিগ্ন হয়েই বা কী লাভ! কেউ তো নেই যে ব্যস্ত হবে। এই বাড়িতে আপাতত আমি কান্তি ভূষণ চৌধুরী আর হরিপদ কেবল। সে আমার দেখাশোনা করে। ব্যাটা রান্নাটান্না করে জল দেখে নীচে তার ডেরায় সেঁধিয়েছে। ফের রাত দশটায় এসে খেতে দিয়ে যাবে। তখন ওর সঙ্গে যা দুটো কথা হবে। আপনি এসেছেন তাই, নইলে এই বাড়ি বহুকাল অন্য মানুষের কণ্ঠস্বর শোনে না। যাক সে সব কথা, আপনি ভেতরে আসুন।

ভেতরে লম্বা ঘরের দু'পাশে আগের আমলের সোফা কোচ আছে গোটা চার। সারা ঘরের দেয়ালে প্রচুর ছবি টাঙানো। মেঝেতে এবং নীচের দেয়ালেও ঠেস দিয়ে রাখা প্রচুর ছবি। হ্যারিকেনের টিমটিমে আলোয় কোনও ছবিই স্পষ্ট করে নজরে আসে না। আলো আঁধারির বিভ্রম তৈরি করে ছবিগুলো অপরিচিত রয়ে যায়। বিজলি বাতি না থাকার জন্য অসুবিধে হচ্ছিল, এবার আদিত্য বলে ফেলেন, আলো কী হল?

সন্ধে থেকেই নেই দেখছি। হরিপদ লণ্ঠন জ্বেলে দিয়ে গেছে। আজ প্রচণ্ড বৃষ্টি হচ্ছে, সঙ্গে ঝড়। বিদ্যুতের তার ছিঁড়ে যেতেই পারে, বলার কিছু নেই। তবে এই অঞ্চলে লোডশেডিঙের দাপট আছে। অনেক সময় টানা দু'দিন পর্যন্ত আলো আসে না।

সামনের সোফায় আদিত্য বসেন। পাশে প্রায় দশ ফুট লম্বা আয়নায় তাঁর প্রতিবিম্ব ফুটে ওঠে। বৃদ্ধ লণ্ঠন কাছে নিয়ে আসাতে পেছনের দেয়ালে তাঁর বড় ছায়া নড়ে ওঠে। হ্যারিকেন মেঝেতে নামিয়ে রেখে বৃদ্ধ প্রশ্ন করেন, মহাশয়ের পেশা কী?

আমি ডাক্তার। তবে সেটা পেশা হলেও গান আমার নেশা। রবীন্দ্রনাথের গানে আমি এক আশ্চর্য আশ্রয় এবং প্রাণের আরামের সন্ধান পেয়েছি।

বাহ্! ভেরি গুড। পেশা হল গিয়ে মানুষের বাইরের জিনিস। আসল হল নেশা, যা জীবনকে চালিয়ে নিয়ে যায়। নেশা আছে বলেই এই প্রায় নির্বাসিত জীবনেও আমার কখনও নিঃসঙ্গ লাগে না। ছবির কাছে আমি অফুরন্ত সঙ্গ পাই।

এখনও আঁকেন? বৃদ্ধের বয়সের কথা চিন্তা করে আদিত্যনারায়ণের মুখ থেকে প্রশ্ন বেরিয়ে আসে।

না ইদানীং আঙুলে বড় ব্যথা লাগে। তবে পুরোনো আঁকাগুলো নেড়ে চেড়ে দেখে এক আশ্চর্য তৃপ্তি পাই। ওই ছবি দেখলে তক্ষুনি মনে পড়ে যায় কখন কোথায় এবং কীভাবে আঁকা হয়েছে।

বড় বড় শার্সির কাচ দিয়ে বিদ্যুতের ঝলক ভেতরে এসে পড়ছে মাঝে মাঝে। ঘরের একপাশে একটা জানলা খোলা। বৃষ্টির ছাঁট অন্যদিকে। তাই জল আসছে না ভেতরে। কিন্তু বাইরের শীতল আমেজ এসে ঘরে সুন্দর পরিবেশ তৈরি করেছে। মাঝে মাঝে জানলা দিয়ে আসা বাইরের দমকা হাওয়ায় লণ্ঠন কেঁপে উঠছে। সঙ্গে সঙ্গে কথোপকথনরত দুটি মানুষের ছায়ারও কেঁপে উঠছে এবং মুহূর্তে বড় হয়ে উঠে পরক্ষণে ছোট হয়ে যাচ্ছে। বাইরে থেকে বৃষ্টির শব্দ আসছে আর ঘরের ভেতরে আলো আঁধারিতে দুটি অসমবয়সি মানুষের আলাপচারিতা একটু একটু করে এগোচ্ছে।

আদিত্যনারায়ণ উঠে খোলা জানলার দিকে যান। ঘন্টাখানেকের মধ্যে বৃষ্টি ধরার লক্ষণ নেই দেখে ফিরে এসে ফের সোফায় বসে পড়ে কান্তিভূষণকে ভালভাবে লক্ষ করতে থাকেন।

লম্বা, রোগা চেহারা। বয়সের ভারে সামান্য ঝুঁকে গেছেন। টকটকে গাত্রবর্ণে ধবধবে পৈতে বেশ মানানসই। বৃদ্ধের চোখমুখে আভিজাত্যের ছাপ প্রবল। ধুতি গেঞ্জি পরে আছেন তিনি। কণ্ঠার হাড় ঠেলে বেরিয়ে এসেছে। বয়স আন্দাজ আশির উপর। তবে এই বয়সেও চোখে চশমা নেই। লণ্ঠনের অল্প আলোয় ঠিকমতো বোঝা যায় না। তবে চোখের মণি পুরো কালো বা কটা নয়, বাদামি ঘেঁষা। এমনটা সচরাচর দেখা যায় না।

এত সব ছবি এঁকেছেন! সময় পেলেন কীভাবে? মানে আপনার পেশার কাজ এবং দায়িত্ব সামলে ছবির জন্য সময় বের করা কঠিন ব্যাপার।

আমার ক্ষেত্রে তেমন শক্ত হয়নি। ভাগ্য কিছুটা সাহায্য করেছে বলতে হবে। দ্বিতীয় বিশ্বযুদ্ধের সময়ে রঙের কারবারে প্রভূত অর্থ আয় করেছি। তার উপর পূর্বপুরুষদের সঞ্চিত অর্থও পেয়েছি। কাজেই টাকার অভাব কোনও দিন হয়নি। পঞ্চাশ সালের পর আর রোজগারের চেষ্টা করিনি। ছবির সান্নিধ্যে জীবনের সেরা সময় কাটিয়ে দিয়েছি।

কারও কাছে আঁকা শিখেছিলেন?

নিশ্চয়ই। প্রথমে অঞ্জন অধিকারীরর কাছে শিখি। উনি থাকতেন বিডন রোতে। এরপর যাঁর সংস্পর্শে এসে ছবিকে গভীরভাবে ভালবাসতে শিখলাম তিনি ডি পি রায়চৌধুরী। উহ্! কী বিরাট শিল্পী ছিলেন। ছাত্রছাত্রীদের কত সহজে আপন করে নিতেন। উনি আমার প্রকৃত শিক্ষাগুরু।

বাহ্ এই ছবিটা দুর্দান্ত এঁকেছেন। নির্জল পুকুরঘাটে স্নানরতা রমনীর এত জীবন্ত ছবি আমি আগে দেখিনি। ডাঃ সেনের কণ্ঠ প্রশংসায় আপ্লুত।

চিত্রকর আদিত্যনারায়ণের কাছে এসে তাঁর কাঁধে মৃদু টোকা দিয়ে বলেন, সজীবতা আমার ছবির মূল বৈশিষ্ট্য। যাঁরা দেখেছেন তাঁরা প্রত্যেকে একমত। এত প্রাণবন্ত ছবি দেখা যায় না।

বৃদ্ধের স্পর্শের ফলে ছবিটি যেন জীবন পায়। আদিত্যর মনে হয় যে ঝড়জলের রাত নয়, তিনি যেন নিজেই পুকুরঘাটে দাঁড়িয়ে আছেন। ওই তো সামনে একজন রঙতুলি নিয়ে সৃষ্টির আনন্দে নিবদ্ধ।

ছবিটা যে এঁকেছিলেন কেউ দেখে ফেলেনি? মানে মেয়েদের স্নানদৃশ্য... সঙ্কোচ কাটিয়ে মনের কৌতূহল মেটানোর তাগিদে প্রশ্ন করে ফেলেন ডাক্তার। বাক্য সম্পূর্ণ করেননি তিনি, তাতে অবশ্য অর্থ বোঝার অসুবিধে নেই।

এরও কারণ আছে। বৃদ্ধের কণ্ঠস্বর কেমন দূরাগত শোনায়, প্রথমত ছবিটি এঁকেছি ষাট সাল নাগাদ। মানে আজ থেকে প্রায় পঞ্চাশ বছর আগে। আর যে গ্রাম দেখছেন ওটা আরিকুল, আরামবাগ থেকে তখন ঘন্টা দুই গরুর গাড়িতে যেতে হত। সেই সময়ে ওসব অঞ্চল ভারী নির্জন ছিল। তাছাড়া...

বৃদ্ধ বোধহয় দম নেবার জন্য থামেন।

তাছাড়া কী?

যিনি স্নান করছিলেন তিনি আমার দূর সম্পর্কের বউদি। বুঝতেই পারছেন ছবি আঁকানোতে তাঁর সম্মতি ছিল। হয়তো ইচ্ছে হয়ে থাকবে তাঁর অনিন্দ্যসুন্দর দেহসুষমার কান্তি চিরকালীন হয়ে থাক। তাই অ্যালাও করেছিলেন।

কিন্তু মনে হচ্ছে আপনার তরফে কোনও দুর্বলতা...

ডাক্তার মৃদু হাস্যে তাঁর কথার অর্ন্তনিহিত অর্থ বুঝিয়ে দেন।

দুর্বলতা? বৃদ্ধ থমকে যান। তারপর আস্তে বলেন, অস্বীকার করব না। আমার দিক থেকে তো ছিলই, মনে হয় ওপক্ষেও থেকে থাকবে।

এ যে একেবারে সিনেমার গল্প বলছেন!

না ওই টুকুই। সে যুগে ওই চাওয়া, দেখা আর গোপন নিঃশ্বাস, এর বেশি কিছু করার সাহসে কুলোয়নি। তবে একটা কথা বলতে পারি। পুরো ছবিটা ঘাটে বসে আঁকিনি কিন্তু। বউদিকে মিনিট পাঁচ-সাত দেখে নিয়েছিলাম স্নানরতা অবস্থায়। তারপর স্টুডিওতে কল্পনার তুলিতে ফুটিয়ে তুলেছি পুরো অবয়ব।

সত্যি। অসাধারণ আপনার তুলির কাজ!

এবার এই ছবিটা দেখুন। ওটা তো পোট্রেট দেখালেন এবার ল্যান্ডস্কেপ। গঙ্গায় সূর্যাস্ত।

ওহ্। দুর্দান্ত! যদিও ছবির টেকনিক্যাল দিক তেমন বুঝি না। কিন্তু এ ছবি আমার মতন এক আনাড়িকেও অশেষ আনন্দ দিতে পারে।

দেখুন গঙ্গার ঢেউ কেমন কলকল করে বয়ে চলেছে! বৃদ্ধ চিত্রকর ডাক্তারবাবুর হাত ধরে ছবির উপর রাখেন।

মুহূর্তে ছবি আরও জীবন্ত হয়ে ওঠে। এতটাই যে আদিত্যনারায়ণের মনে হয় যেন ঢেউয়ের ছলাৎ ছলাৎ শব্দ শুনতে পাচ্ছেন।

এই ছবি কোন সময়ে আঁকা হয়?

এটা সত্তর সাল নাগাদ।

অর্থাৎ তখন আদিত্যনারায়ণ ডায়মন্ডহারবারের কাছে বাড়ি করেছেন। এমনও হতে পারে এই ছবিটি আঁকার সময়ে ডাক্তার সেন নিজেও গঙ্গার ধারে উপস্থিত ছিলেন। তখন দেখেননি, আজ এতকাল বাদে এক বিকেলের রাঙা সূর্যাস্ত তাঁর মনে বিষাদের মেদুর রং ভরিয়ে দিল।

আর দেখবেন? চিত্রকর কৌতূহলী দর্শক পেয়ে উৎসাহী।

নাহ্। আজ থাক। আসলে এতক্ষণ যা দেখেছি তা এত সুন্দর এবং মন এত আনন্দে ভরে গেছে যে একান্তে ভাবতে চাই এই নিয়ে।

ভাবুন, খুব ভাবুন। ভাবনাটাই তো হল আসল জীবন। উই আর হোয়াট থটস হ্যাভ মেড আস।

বাহ্! দুর্দান্ত বলেছেন।

স্বামী বিবেকানন্দের কথা।

আদিত্যনারায়ণ সোফায় বসে সিগারেট বের করে বলেন, আপনার অসুবিধে হবে না তো?

না তেমন নয়। এককালে আমিও খেতাম। কিন্তু কাজের মাঝে খেতে ইচ্ছে হলে ছবি আঁকায় বেশ ব্যাঘাত ঘটত বলে অনেক কষ্টে ছেড়েছি।

সিগারেটের ধোঁয়ার রিং কুন্ডলী পাকিয়ে উপরে উঠে মিলিয়ে যাচ্ছে। লণ্ঠনের ক্ষীণ আলো এই বড় ঘরের আঁধার সম্পূর্ণ দূর করতে পারেনি। ফলে ঘরেতে আলো আঁধারি ঘেরা আবছা পরিবেশ। এই পরিবেশে কথা বলে যেতে হয়। নইলে কেমন যেন ঝিমুনি ধরে। বৃদ্ধের সামনে বসে সিগারেটে টান দিতে দিতে হঠাৎ আদিত্যনারায়ণের মনে হয় বাজের শব্দ অনেকক্ষণ শোনা যায়নি। তিনি খোলা জানালার কাছে যান। বৃষ্টি এখনও পড়ছে তবে সেই প্রবল ভাব বেশ স্তিমিত। চারপাশের ঝাপসা ভাব অনেক কেটে গেছে। তিনি ঘড়ির দিকে তাকাল। রাত নটা। ওরেব্বাস! এখানে কখন তিন ঘন্টা কেটে গেছে বুঝতে পারেননি একদম।

সিগারেট শেষ করে তিনি চিত্রকরকে বলেন, জল কমে গেছে। এবার মনে হয় গাড়ি চালাতে অসুবিধে হবে না।

যাবেন?

হ্যাঁ, তবে শিগগির ফের আসব। আপনার ছবি আমাকে একেবারে মোহিত করে দিয়েছে।

এলে খুশি হব। কান্তিভূষণ অল্প অল্প হাসেন।

গোলপার্কে তাঁর ফ্ল্যাটে যখন পৌঁছোলেন এগারোটা বেজে গেছে। স্ত্রী কনকলতা বলেন, ভেবেছিলাম তুমি আর এলে না। এত বৃষ্টি হচ্ছে,

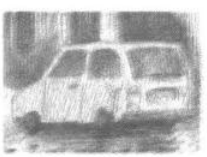

মানে আজ থেকে প্রায় পঞ্চাশ বছর আগে। আর যে গ্রাম দেখছেন ওটা আরিকুল, আরামবাগ থেকে তখন ঘন্টা দুই গরুর গাড়িতে যেতে হত।

সাদা দাগ

এখন সম্পূর্ণ নিরাময়যোগ্য

পার্শ্বপ্রতিক্রিয়াহীন

চিকিৎসায় সুফল পাওয়ার সম্পূর্ণ গ্যারান্টি। আমাদের নতুন আবিষ্কৃত ওষুধ ব্যবহারের ৫-৬ ঘন্টার মধ্যে দাগের রঙ বদলে স্বাভাবিক চামড়ার রঙের সাথে মিশে যায় এবং চিরদিন তা বজায় থাকে। সম্পূর্ণ চিকিৎসার জন্য ফোন মারফৎ যোগাযোগ করুন।

যৌন সমস্যা

কোনরকম পার্শ্বপ্রতিক্রিয়া ছাড়াই আপনার লিঙ্গের দৈর্ঘ ৩-৪ ইঞ্চি বাড়িয়ে নিন। লিঙ্গকে স্থূল ও সোজা করে তুলুন এবং রতিক্রিয়া ২০-২৫ মিনিট পর্যন্ত স্থায়ী করুন। লিঙ্গ বর্দ্ধক বিনামূল্যে।

১০০% ভেষজ

আকর্ষণীয় স্তন

আমাদের শতকরা ১০০ভাগ গ্যারান্টিযুক্ত পার্শ্ব প্রতিক্রিয়াহীন ওষুধে আপনার স্তনকে সুন্দর, সঠিক আকৃতিবিশিষ্ট, আকর্ষণীয় এবং আঁটসাট করে তুলুন।

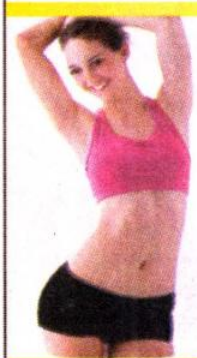

মেদবহুলতা

অতিরিক্ত ভুঁড়ি অবহেলা করবেন না। আপনার একগুঁয়ে মেদ তাড়িয়ে সঠিক দেহের আকার পেতে আমাদের চিকিৎসা গ্রহণ করুন।

স্মৃতিশক্তি

কোনরকম পার্শ্বপ্রতিক্রিয়া ছাড়াই ৩০ দিনের মধ্যে আপনার স্মৃতিশক্তিকে বাড়িয়ে তুলুন। বলিষ্ঠ স্মৃতিশক্তিই আপনার সাফল্যের সূচক।

উচ্চতা বৃদ্ধি

আমাদের শতকরা ১০০ভাগ ভেষজ চিকিৎসায় কোনরকম পার্শ্বপ্রতিক্রিয়া ছাড়াই ৬ সপ্তাহের মধ্যে উচ্চতা বাড়িয়ে তুলুন। এক্ষুনি ফোন করুন।

অর্শ

আমাদের চিকিৎসায় রক্তপাত বা ক্ষতযুক্ত অর্শ নির্মূল হয় রক্তপাত বন্ধ করে গুটিকে ভেতর থেকে শুকিয়ে পতন ঘটায়। এক্ষুনি ফোন করুন।

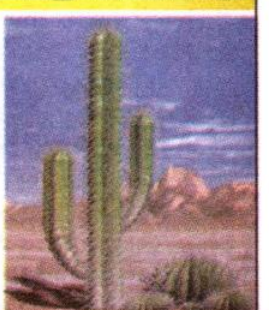

09661833217 / 09905429328 / 09525536846

ওষুধ কেনার আগে বিশ্বস্ততার প্রতীক বৈদ্য বিজয় কুমারের নাম দেখে নিন

অনেক জায়গায় জল জমে গেছে।

ওদিকের রাস্তায় জমেনি। এদিকে চেতনার কাছে পেয়েছি।

আদিত্য সেই অদ্ভুত চিত্রকর, জীর্ণ বাড়ি এবং ছবির কথা আর তুললেন না। বেশ ক্লান্ত লাগছিল। কিছু খেয়ে নিয়ে বিছানায় যেতেই চেতনা অবশ হয়ে এল।

ছেঁড়া ছেঁড়া স্বপ্ন ঘুম-জাগরণের মাঝে সেতু রচনা করতে থাকল। তিনি দেখলেন ছুটির বিকেলে গঙ্গায় নৌকো চেপে ঘুরছেন। ফুরফুরে হাওয়ায় তাঁর শরীর-মন জুড়িয়ে যাচ্ছে। হঠাৎ নজরে পড়ে সামনে এক নৌকোয় কান্তিভূষণ তাঁর মতো ভ্রমণ করছেন। মাঝিকে সামনের নৌকোর নাগালে যেতে বলেন। মাঝি অনেক চেষ্টা করেও ওটিকে ধরতে পারে না। তিনি বলতে থাকেন, জোরে... আরও জোরে...

পরদিন খুব ভোরে ঘুম ভেঙে যায় আদিত্যনারায়ণের। ঘড়ি দেখেন। সাড়ে পাঁচটা। গতকালের কথা মনে আসতে শিহরণ হয়। সত্যি অসাধারণ অভিজ্ঞতা হয়েছে গতরাতে। কিন্তু প্রথমে ওই দুর্যোগের মধ্যে আশ্রয় হিসেবে বাড়িটা পেতে তিনি খুবই আশ্বস্ত হয়েছিলেন ঠিক, তবু বেশ যে ওই বড় প্রাসাদটিকে বিদ্যুতের আলোয় এক ঝলকে দেখে কেমন চেনা মনে হয়েছিল। কোনও লোক নেই, কেউ তাঁকে পথ দেখিয়ে নিয়ে যায়নি অথচ কী অবলীলায় তিনি দোতলায় পৌঁছে গেলেন। তবে কি তিনি আগে কখনও ওই বাড়িতে গিয়েছিলেন? না একদম নয়, কস্মিনকালেও ওই অট্টালিকার ত্রিসীমানায় তিনি যাননি। তবে কেন অত চেনা মনে হল! তাঁর বিজ্ঞানমনস্ক চেতনা উত্তর খুঁজতে থাকে এবং পেয়েও যায়। আসলে গত সন্ধ্যায় ঝড়জলে পড়ে তিনি খুব ক্লান্ত হয়ে পড়েছিলেন। ওই অবস্থায় প্রথমে এক ঝলক বাড়িটা দেখেই তিনি ভুলে গেছেন। সেই অবস্থায় মনে হয় যে এখানে সবকিছু তাঁর অতি পরিচিত। খুব ক্লান্তির ফলে মানুষের স্মৃতি মুহূর্তের মধ্যে মলিন হতে পারে। তখন একটু আগের দেখা বাড়িকেই মনে হয় যেন কতকালের চেনা। জুতসই ব্যাখ্যা পেয়ে উৎফুল্ল হয়ে ওঠেন ডাক্তার।

কিন্তু চিত্রকর চৌধুরী! কী অদ্ভুত আর অতীতচারী তাঁর চেহারা। দেখলে মনে হয় যেন পাঁচশো বছর আগের কোনও চরিত্র জীবন্ত পেয়েছে। আর কণ্ঠস্বর! যেন বহুদূর থেকে ভেসে আসছে সেই ধ্বনি। তবে এমন তো হয়। এক একজনের চেহারা এবং চলনবলনে একটা ধ্রুপদী ব্যাপার থাকে। এঁরা সাময়িক হয়েও তাই চিরকালীন হয়ে ওঠেন। বৃদ্ধ চিত্রকর ঠিক সেই জাতের। কিন্তু শান্তিভূষণের কি ভৌতিক বা দৈবিক কোনও ক্ষমতা আছে? নইলে তিনি যখন কোনও ছবি দেখিয়ে আদিত্যনারায়ণকে স্পর্শ করছিলেন ছবি অমন জীবন্ত হয়ে উঠছিল কেমন করে? এই প্রথম ডাক্তারের মন তোলপাড় করতে থাকে। তিনি উত্তর খুঁজতে খুঁজতে অবসন্ন হয়ে পড়েন। এক সময় মনে হয় তিনি অযথা বেশি ভাবছেন। আসলে গতরাতের চেহারাই ছিল দুর্যোগপূর্ণ। অত খারাপ আবহাওয়াতে ওই রকম এক বিশাল আর প্রাচীন বাড়ি যে কোনও মানুষের কাছেই ভৌতিক বলে মনে হতে পারে। তার উপর যুক্ত হয়েছিল ক্রমাগত বিদ্যুৎ চমক। নীল আলোর প্রেক্ষাপটে ভাঙা প্রাসাদের জরাজীর্ণ রূপ জেগে উঠেই মিলিয়ে যাচ্ছে। ওহ্! এ যে একেবারে হরর ফিল্মের আবহ। প্রথম থেকেই তাঁর অবচেতন মনে ঝড়জল এবং ভগ্ন প্রাসাদ প্রভাব বিস্তার শুরু করেছিল। তিনি খুব বেশি জড়িয়ে পড়েছিলেন ওই অদ্ভুত আবহে। এর ফলে হয়তো সাময়িক সাইকিক হয়ে উঠেছিলেন। তাই বৃদ্ধ যখন তাঁকে স্পর্শ করে হিমশীতল কণ্ঠে বলে, ছবিটা কী জীবন্ত, তখন তিনি ওই পরিবেশের প্রভাবে ছবির ঘটনা সিনেমার মতন প্রত্যক্ষ করতে থাকেন। ডাক্তারি পরিভাষায় একেই বলে টেম্পোরারি ড্রপ আউট অফ সেনসেস।

তবে যাই হোক, কান্তিভূষণ চৌধুরী যে এক আশ্চর্য চরিত্র তাতে সন্দেহ নেই, এবং বাড়িটিও খুব আকর্ষণীয়। ফের ওই বৃদ্ধ ও প্রাসাদোপম অট্টালিকায় তাঁকে যেতে হবে। এবার দিনের আলোতে যাবেন। আর সবদিন তো ঝড়জল হবে না, তাই রাতের আঁধারে বিদ্যুতের রহস্যও থাকবে না। তখন ওই বাড়ি এবং তার বয়স্ক বাসিন্দা তাঁর মনে কী রেখাপাত করে সেটা দেখার আগ্রহে তিনি উৎসাহিত হয়ে ওঠেন। তবে সপ্তাহের মাঝে তো সব কাজকর্ম ফেলে যেতে পারেন না। তাই তাঁকে অপেক্ষা করতে হবে সেই শনিবার পর্যন্ত।

সোমবার থেকে ডাক্তার সেন নার্সিংহোমের কাজে ব্যস্ত থাকলেও মাঝে মাঝে বিশাল চৌধুরী ভিলা, বৃদ্ধ চিত্রকর এবং ঝড়জলের রাতের কথা মনে পড়ে যেতে বিচিত্র অনুভূতি হচ্ছিল। একই সময়ে এই পৃথিবীর নানা স্থানে কত বিচিত্র কাণ্ড যে ঘটে যাচ্ছে তা মনে হতে বিস্মিত হলেন।

সপ্তাহের পাঁচদিন কাজের পর শুক্রবার রাতে ডায়মন্ডহারবারে পৌঁছে আদিত্যনারায়ণের মন ছটফট করতে থাকে। কখন সেই প্রাচীন অট্টালিকার নিরালা ঘরে একান্তে কান্তিভূষণের মুখোমুখি হবেন সেই চিন্তায় অস্থির হয়ে ওঠেন। বৃদ্ধের চুম্বকের মতন আকর্ষণী শক্তি আছে যেন। একবার ভেবেছিলেন রবিবার বিকেলে ডায়মন্ডহারবার থেকে ফেরার সময় চৌধুরী ভিলায় ঢুঁ মারবেন। কিন্তু মন এত চঞ্চল হয়ে ওঠে যে দেরি করতে পারেন না। শনিবার দুপুরেই তিনি চৌধুরী ভিলার দিকে রওনা হয়ে যান। এতে ভালো হল। তিনি দিনের আলোয় সবকিছু প্রত্যক্ষ করতে পারবেন। রাতের আঁধার তাঁর মনে কোনও মায়াবিভ্রম তৈরি করতে পারবে না।

কান্তিভূষণের ভিলায় বিকেলের আগেই পৌঁছে গেলেন। ঘড়ি দেখেন। তিনটে দশ। দিনের আলোয় বাড়িটা ভাল করে দেখতে থাকেন। খুব যে প্রাচীন তা নয়, কেবল রক্ষণাবেক্ষণের অভাবে বাড়ির চেহারায় অকাল বার্ধক্যের ছাপ ফুটে উঠেছে।

বাড়ির ভেতরে বাগান ডাক্তার সেনকে টানে। সদর পেরিয়ে বাগানের দিকে যান। এককালে যত্ন ও পরিচর্যালালিত গাছেরা এখন পরিত্যক্ত শিশুর মতো দাঁড়িয়ে আছে। এখনও শিশুর লাবণ্য পুরো মিলিয়ে যায়নি, কিন্তু ভাটার টান পড়েছে নিঃসন্দেহে। ছোট ছোট ফুলগাছের পাশে আগাছা বা কাঁটাঝোপ এখনও মাথা তোলেনি তবু ফুলগাছেরা যে যত্নআত্তি পায় না দেখলে বোঝা যায়।

বাগানের এক কোণে একটি পুকুর। বাঁধানো ঘাটের পাশে শ্বেতপাথরের নারীমূর্তি একাকিনী দাঁড়িয়ে। এই পুষ্করিনীর স্বচ্ছ জল অনতি অতীতে সুন্দরীদের নিরাবরণ সুঠাম দেহসুষমার ক্লান্তি দূর করে কোমলাভা ফিরিয়ে দিয়েছে। আজ আর কেউ নেই, শুধু কয়েকটি পাখি করুণ স্বরে ডেকে চলেছে এবং গাছপালার মধ্য দিয়ে বাতাস কেটে যাবার শনশন শব্দ মনের ভেতর এক বেদনাবিধুর

আদিত্যনারায়ণের মন ছটফট করতে থাকে। কখন সেই প্রাচীন অট্টালিকার নিরালা ঘরে একান্তে কান্তিভূষণের মুখোমুখি হবেন।

আর্তি জাগিয়ে তুলছে। এই নির্জনতায় বেশিক্ষণ থাকা যায় না, থাকলে বাতাসের করুণ রাগিনীর বিষাদময়তা সমস্ত দেহে মনে ছড়িয়ে যায়।

বাড়িটা ঘুরেফিরে দেখার একটা কারণ মালিকের চরিত্রের গতিপ্রকৃতি আন্দাজ করা। বাগান ও পুকুর দেখা হলে ডাক্তার সেন সদরের দিকে ফিরে আসতে একজন অভ্যর্থনা জানায়, আসুন।

তিনি অবাক চোখে তাকাতে লোকটি বলে, বাবু আপনার কথা বলেছে। সেজন্য বসে আছি।

কথাটা শুনে ডাক্তার চমকে যান। বাগানে গিয়ে তাঁর কেমন শিরশিরানি হয়েছিল। এখন এই ভৃত্যের কথায় তাঁর ভয় করতে থাকে। কেমন যেন মনে হয় এই বাড়িতে আসা অবধি তিনি যা করেছেন সব পূর্বনির্দিষ্ট, তিনি কেবল অভিনেতা। কোনও এক দক্ষ সঞ্চালক আড়াল থেকে নিপুণ হাতে সুতো নাড়িয়ে চলেছেন।

ভৃত্যের সঙ্গে দোতলায় উঠে নির্দিষ্ট ঘরে পৌঁছোতে কান্তিভূষণ বলেন, আসুন আপনার জন্য অপেক্ষা করছি।

আশ্চর্য, আপনি আমার আসার কথা জানতেন। মনে হয়েছিল আপনি ফেরত না এসে পারবেন না।

সত্যি সেদিন আপনার কাজ এত ভালো লাগল। আজ ছবি ভালো করে দেখব বলে দিনের আলো থাকতে থাকতেই হাজির হয়েছি।

ছবি দেখবেন? তা বেশ। কিন্তু আমি ভাবছিলাম... বাক্য অসমাপ্ত রেখে চিত্রকর চৌধুরী সামনের একটি ছবির দেখে স্থির দৃষ্টিতে তাকিয়ে থাকেন। খানিক অপেক্ষা করে কৌতূহলী সেন সাহেব প্রশ্ন করেন, কী ভাবছিলেন?

ভাবছিলাম এই যে রেখার টানে ভরা চিত্র, একে আপনি চিরকালীন করে নিন না?

চিরকালীন?

হ্যাঁ, আপনার মুখশ্রী ভারি ফটোজিনিক। সেদিনই ভেবেছিলাম, যদি আবার কখনও দেখা হয় তবে ওই মুখ এঁকে নেন।

বাহ্! এ তো আমার সৌভাগ্য। কী করতে হবে? তেমন কিছু নয়। শুধু দিন দুই ঘন্টা তিন করে সিটিং দিতে হবে।

আমি রাজি, ডাক্তার সেন বলেন, কিন্তু একভাবে অতক্ষণ বসে থাকা দারুণ শক্ত। যদি বই পড়ি আপত্তি আছে?

না। কেবল মাঝে মাঝে মুখ তুলে তাকাবেন।

আদিত্যনারায়ণ রাজি হতে চিত্রকর চৌধুরী কাজ শুরু করে দেন। বড় বড় জানলা দিয়ে সূর্যের আলো ঢুকে ঘরের ছবিগুলোকে উজ্জ্বল করে তুলেছে। সকালের আবছা লাল আভায় ছবিরা আরও বর্ণময়। আদিত্য কোলের উপর রাখা বইয়ে চোখ রাখলেও মনোনিবেশ করতে পারেন না। মাঝে মাঝেই চোখ তুলে জানলা দিয়ে বাইরের বাগানের দিকে তাকিয়ে থাকেন। শুধু বসে তিন ঘন্টা সময় কাটানো যে কত শক্ত তা মর্মে মর্মে অনুভব করেন।

যখন মনে হচ্ছিল আর পারবেন না, এবার উঠতেই হবে, সেই সময় চৌধুরী বলেন, এই যে দেখুন। তবে কাজের অর্ধেকও এখন হয়নি।

সেন সাহেব দেখেন দক্ষ হাতের কুশলী রেখায় তাঁর মুখের আদল অস্পষ্ট ফুটে উঠছে। কোথাও আবছা, কোথাও গভীর পুঞ্জ পুঞ্জ রেখার টানে মুখের ভাবভঙ্গি তুলে ধরা হয়েছে। তাঁর মুখ থেকে স্বতঃস্ফূর্ত প্রশংসার ধ্বনি বেরিয়ে আসে, বাহ্। এ যে দুর্দান্ত!

এখন শুধু আউটার স্কেচ করেছি। বহু কাজ বাকি আছে। রঙ চড়ালে ছবি অন্য মাত্রা পেয়ে যাবে। ভাগ্যিস সেই রাতে বৃষ্টি এসেছিল। তাই আশ্রমের সন্ধানে এখানে এলাম। আর আমার অজানা এক জগতের দরজা কেমন রহস্যজনকভাবে খুলে গেল। আদিত্যনারায়ণের স্বরে আবেগ।

বৃষ্টি না এলেও হয়তো দেখা হয়ে যেত। কে জানে! বৃদ্ধ খানিক থেমে বলেন, পরের দিন মনে হয় ছবিটা আপনাকে দিতে পারব।

কিন্তু আপনার পারিশ্রমিক? ডাক্তার দ্বিধাগ্রস্তভাবে

জিজ্ঞাসা করেন।

আপনার সঙ্গে এই যে সম্পর্ক গড়ে উঠল এটা কি কিছু কম?

তাহলেও...

না না। আপনি মনে কোনও দ্বিধা রাখবেন না। এই বয়সে টাকা নিয়ে করব কী? যা আছে তাতে যখন দিব্যি চলে যায়।

এই কথায় আদিত্য কোনও উত্তর দিতে পারেন না। চুপ করে যান।

চৌধুরী ভিলা থেকে যখন ডাক্তার সেন বেরোন ছ'টা বেজে গেছে। বিকেলের আলো শেষ হয়ে আসন্ন সন্ধ্যার পানসে রঙে ছেয়ে যাচ্ছে পৃথিবী। ডায়মন্ডহারবারে বাড়ির দিকে গাড়ি চালাতে চালাতে নানা চিন্তা ভর করে তাঁর উপর। এত চিন্তা নিয়ে গাড়ি চালানো ঠিক হবে না ভেবে তিনি রাস্তার ধারে গাড়ি রেখে ভাবতে শুরু করেন। আগে যে ভাবনাটা ছিল অর্থাৎ চৌধুরী ভিলায় তাঁর সব কার্যকলাপে নিজের কোনও হাত নেই, সবই পূর্বনির্দিষ্ট, তা-ই দৃঢ় হয়। বৃদ্ধ চিত্রকর কিছু বললে তা অমান্য করা ডাক্তারের সাধ্যাতীত। যেমন তিনি কেন নিজের ছবি আঁকতে দিতে রাজি হয়ে গেলেন? এমন নয় তো যে ওই ছবির জালে তাঁকে জড়িয়ে নিলেন কান্তিভূষণ? ওই ছবি চিত্রকরের কাছে থাকার ফলে যখনই কান্তিভূষণ ডাকবেন তাঁকে ছুটতে হবে। একেই তো ওই চৌধুরী বাড়ি এবং বৃদ্ধ চিত্রকরের প্রতি এক অদম্য আকর্ষণ গড়ে উঠেছে তাঁর মনে। এর সঙ্গে যুক্ত হল তাঁর ছবি। নাহ্। কান্তিভূষণের অনুরোধে রাজি হওয়া একেবারেই যুক্তিযুক্ত হয়নি। কেমন যেন এক রহস্যে তিনি ডুবে যাচ্ছেন। এই রহস্যে মারদাঙ্গা নেই, রক্তপাতের বিভীষিকা নেই, আছে টান, এক অদম্য মায়াবী আকর্ষণ। সে আকর্ষণ এমনই গভীর, এমনই অমোঘ যে ডাক্তারের মনে হচ্ছে ডায়মন্ডহারবারে তাঁর নিজের বাড়ি না ফিরে চৌধুরী ভিলায় রাত কাটানো যেন ঠিক হত। কীসের এই টান? বৃদ্ধ কি যাদু জানে? পরক্ষণে নিজের চিন্তায় হেসে ওঠেন ডাক্তার সেন। কান্তিভূষণ অদ্ভুত মানুষ ঠিকই, তবে গুণী আঁকিয়ে সন্দেহ নেই। ওঁর হাতে তাঁর নিজের ছবি আঁকতে দিয়ে তিনি ঠিক কাজই করেছেন। আর ভাগ্যিস সেদিন আকাশভাঙা বৃষ্টি এসেছিল। তাই তো অমন ভগ্ন প্রাসাদ আর অদ্ভুত মানুষের সন্ধান তিনি পেয়েছেন। অবশ্য বৃষ্টি না এলেও বৃদ্ধ এবং অট্টালিকায় তাঁকে যেতে হত। কিছু দিন সময় লাগত হয়তো। আদিত্যনারায়ণের দৃঢ় ধারণা, ওই বাড়ি এবং চিত্রকরের সঙ্গে সাক্ষাত নিশ্চয়ই হত এবং এই সাক্ষাতে তাঁর নিজের লাভ বই ক্ষতি হয়নি। নতুন এক অভিজ্ঞতায় সমৃদ্ধ হয়ে উঠেছেন তিনি। এই জীবনে যদি নানা অভিজ্ঞতা না হল তবে বেঁচে থেকে লাভ কী! এইসব চিন্তার ফলে বেশ স্বস্তিবোধ করেন ডাক্তার। নিশ্চিন্ত হয়ে গাড়ি স্টার্ট করেন।

রাতে ডাঃ সেন বাসায় ফিরে লক্ষ করেন ছবির প্রতি তীব্র এক টান অনুভব করছেন। ছবি সম্বন্ধে অনেক কিছু জানতে ইচ্ছে করছে। তাঁর ব্যক্তিগত সংগ্রহে ছবি সম্পর্কে বই ছিল না। ফলে ছবির উপর জ্ঞান অর্জনের আকাঙ্ক্ষা পূরণ করার কোনও উপায় খুঁজে পেলেন না।

পরের দিন রং-তুলি এবং ছবি আঁকার অন্য সরঞ্জাম কিনে ফেললেন। কোনওদিন হাতে তুলি নিয়ে দেখেননি, কিন্তু আজ তুলি আঙুলে তুলতে মনে হল যেন অনেক দিনের নিবিড় পরিচয় এর সঙ্গে।

সারা সপ্তাহ, 'করতে হয় বলে করা' গোছের মনোভাব নিয়ে নার্সিংহোমের কাজ কোনগতিকে সামলে দিলেন।

কিন্তু সমস্ত চিন্তাধারা জুড়ে ছিল ছবি এবং কান্তিভূষণের সঙ্গে তাঁর কথোপকথনের স্মৃতি।

শুক্রবার এসে তিনি হাঁফ ছেড়ে বাঁচেন। আজ বিকেল থেকে সোমবার সকাল পর্যন্ত তিনি সম্পূর্ণ মুক্ত। শুক্রবার বিকেল চারটে বাজার আগেই হাজির হলেন পার্কস্ট্রিটে অক্সফোর্ড বুক সেন্টারে। সেখানে হাউ টু ড্র পিকচার্স, ছবি কাকে বলে, ভারতীয় চিত্রকলার ইতিহাস এবং ছবি সংক্রান্ত অন্যান্য গোটা চার বই কেনেন। বইগুলো পড়ার জন্য চঞ্চল হয়ে ওঠে তাঁর মন।

প্রথম জীবনে নার্সিংহোম শুরু করার সেই সব দিনে কাজের প্রতি যেমন আকর্ষণ অনুভব করতেন এখন এই পরিণত বয়সে পৌঁছে ছবির প্রতি তাঁর দ্বিগুন আকর্ষণ বোধ করতে লাগলেন। ডায়মন্ডহারবারে তাঁর বাড়ি নিরালাতে সন্ধে নামার আগেই পৌঁছে যান। বাড়ির গেট থেকে সামনে তাকাতে বিশাল গঙ্গার ব্যাপ্তি, ঘনিয়ে আসা সন্ধ্যার স্তিমিত প্রকৃতি, ঘরে ফেরা পাখির কলকাকলিতে মুগ্ধ হলেন। এই গঙ্গা, প্রকৃতি, আকাশ এবং তাদের সমস্ত পূর্ণতা যদি ক্যানভাসে ধরে রাখতে পারতেন তবে অনবদ্য হত।

'নিরালা'-তে কেয়ারটেকার অনুকূল থাকে। ভারি বিশ্বস্ত আর অনুগত। তাঁর সুবিধা অসুবিধার দিকে সদা দৃষ্টি। ওর জন্যই 'নিরালা'-তে থাকতে ডাক্তারের কোনও দিন কোনও অস্বস্তি হয়নি।

বাংলায় পৌঁছে স্নান সারা হতে অনকূল গরম পরোটা, বেগুন ভাজা, চিকেন কারি এবং কফি দেয়। খাওয়া শেষ হলে আদিত্যনারায়ণ ছাদ থেকে গঙ্গার শোভা উপভোগ করতে থাকেন। জলেতে চাঁদের ঝিলিক প্রতিফলিত হয়ে লক্ষ ঝকমকি তৈরি করছে। নদীর উপর ইতস্তত ভাসমান দু-একটা নৌকো, তাদের পুরো বোঝা যাচ্ছে না কেবল আকৃতির একটা সিল্যুয়েট তৈরি হয়ে জলের প্রেক্ষাপটকে আরও আকর্ষণীয় করে তুলেছে। প্রকৃতির এই অনুপম শোভা ধরে রাখার জন্য ডাক্তারের মন ব্যস্ত হয়ে ওঠে। ঘরে এসে কাগজ চাপান। তুলি হাতে নিতে ফের অনুভব করেন যেন বহুদিন এই তুলির টানে ছবি এঁকেছেন। চিন্তাটা প্রথমে তাঁকে আচ্ছন্ন এবং ক্রমশ দৃঢ়প্রতিজ্ঞ করে তোলে—ছবি তিনি আঁকবেনই।

কাগজে প্রথম টান দিতে ডাক্তারের মনে হয় তিনি যা আঁকতে চলেছেন সেই সম্বন্ধে। তাঁর স্বচ্ছ ধারণা আছে। গঙ্গার যে মনমাতাল দৃশ্য তিনি আজ বাড়ির ছাদ থেকে দেখেছেন তা তাঁর মনে দৃঢ়ভাবে প্রোথিত হয়ে আছে এবং তিনি অনায়াস দক্ষতায় তুলি চালিয়ে চলেছেন। যেন এই আঙুল তাঁর নয়, তুলি কেবল তিনি ধরে আছেন। সঞ্চালন করছে অন্য কেউ।

আউটলাইন স্কেচ হতে মোটামুটি ঘণ্টা চার সময় লেগে যায়। স্কেচটা তাঁর নিজের চোখে অপূর্ব মনে হয়। কিন্তু সত্যিই কি তাই? যাচাই করার উপায় নেই। অনুকূল অনেকক্ষণ ঘুমিয়ে পড়েছে। তাছাড়া ছবি সম্পর্কে তাঁর জ্ঞানই বা কতটুকু।

এক অস্থিরতার মধ্যে আদিত্যনারায়ণ বাড়ি ছেড়ে বের হন। গঙ্গার ধারে এসে তিনি ফের অনাবিল আনন্দ পান। পূর্ণিমার চাঁদ জলে পড়ে হাজার হাজার হিরে-মানিক সৃষ্টি করছে। ঢেউয়ের মাথায় মাথায় সেই বিচ্ছুরণ ফসফরাসের মতো জ্বলছে। শান্ত নিস্তব্ধ প্রকৃতির মধ্য দিয়ে গনগন করে মধ্যরাতের বাউলি বাতাস কেটে যাচ্ছে।

এই ছবি তাকে পুরো আবিষ্ট করে ফেলে। কতক্ষণ এভাবে কেটেছে আদিত্য জানেন না। খেয়াল হতে দেখেন তিনি চৌধুরী ভিলার দরজায় এসে পড়েছেন।

তার মানে প্রায় আধঘণ্টা তিনি হেঁটেছেন অথচ কিছু বুঝতে পারেননি। কী যে হল তাঁর! এখানে এসে যখন পড়েছেন কান্তিভূষণের সঙ্গে দেখা না করে চলে যাওয়ার মানে হয় না।

এই বাড়ির বড় দরজাটা বোধহয় রাতেও বন্ধ হয় না। তিনি আস্তে আস্তে দোতলায় পৌঁছে যান। নির্দিষ্ট ঘরে গিয়ে দরজায় দু'বার টোকা দিতে আওয়াজ আসে, দাঁড়ান।

লণ্ঠন তুলে ধরে বৃদ্ধ চিত্রকর দরজার ওপার থেকে সহাস্যে বলেন, আসুন। আমি আপনার জন্যই অপেক্ষা করছি।

আদিত্যনারায়ণ যন্ত্রচালিতের মতো ঘরে ঢুকে যান। ❖

অলঙ্করণ : রৌদ্র মিত্র

বানভাসি

সু ব্র ত সে ন

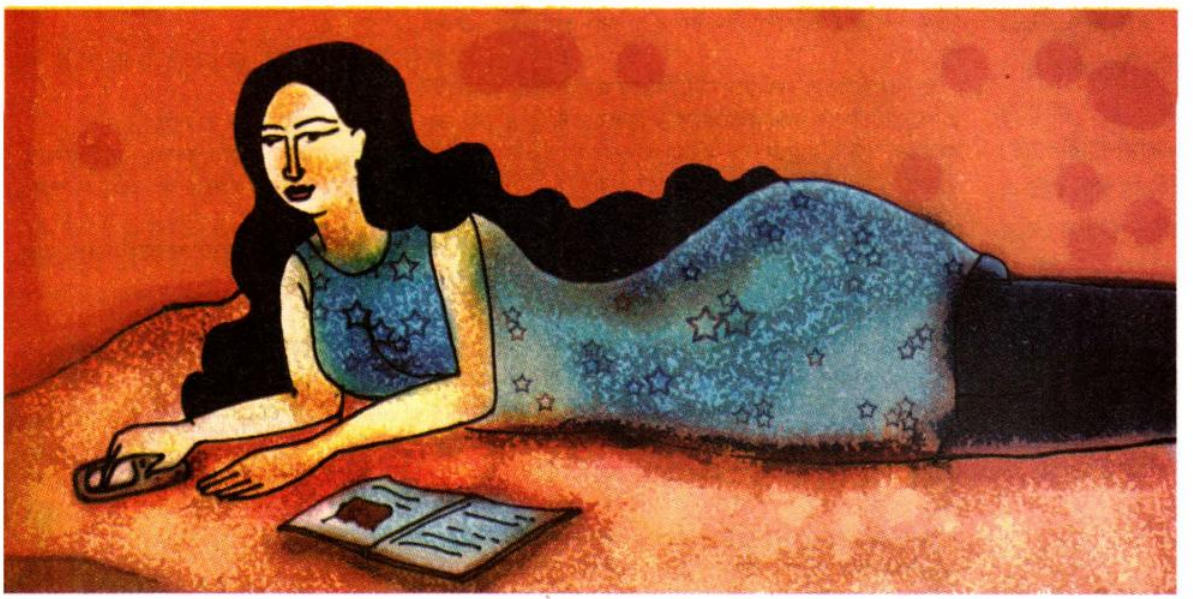

পাত্রী দেখতে যখন ছেলেরা আসে তখন অনেক লোকজন নিয়ে আসে। একজন দু'জন বন্ধু, মামা বা কাকা টাইপের কেউ। কারও সঙ্গে খুড়তুতো দিদি-টিদিও থাকে, মধ্যবয়সি মামিমা আসে অনেক সময়।

২

ভাবটা এমন, সবাই মিলে দেখেশুনে তবে পাত্রের বিয়ে ঠিক হবে।

নদীর বাড়ির বসার ঘরটা ছোট। খুব বেশি লোক এলে ঘরে ভিড় হয়ে যায়। সোফায় সবাই ধরে না। তখন খাবার জায়গা থেকে ডাইনিং চেয়ারগুলোও বার করে দিতে হয়। বাবা খুব বিনীতভাবে বলতে থাকে, 'আসলে বাড়িটা ছোট, আপনাদের অসুবিধে করলাম!'

পাত্রপক্ষের মধ্যে যে কাকাস্থানীয় ব্যক্তিটি থাকে, সে ভদ্রতা করে বলে, 'না, না, কীসের অসুবিধা! পরিস্থিতির সঙ্গে মানিয়ে নেওয়াই তো মানুষের ধর্ম।'

ওই ভিড়ের মধ্যে শাড়ি পরে নদীকে গিয়ে দাঁড়াতে হয়। কোন লোকটা বিয়ে করতে চায় আর কোন লোকটা স্রেফ মেয়ে দেখার ছলে এসেছে তা বোঝা যায় না। বাবা মুখে সামান্য একটু হাসি ফুটিয়ে বলার চেষ্টা করে, 'এ আমার মেয়ে। পড়াশুনায় খুব ভালো ছিল, জানেন? এখন মাল্টিন্যাশনাল কোম্পানিতে জব করছে। নিজের মেয়ে বলে বলছি না, আসলে... '

আরও কিছু বলার চেষ্টা করে বাবা। সে সব কথা নদীর কানে ঢোকে না। তার রাগ হতে শুরু করে ভিতরে ভিতরে। মনে হয় বাবা সেলসম্যানগিরি করছে। নিজের মেয়েকে নিয়ে। বরাবর কেরানির চাকরি করেছে বাবা, সেলসম্যানগিরি যে তার দ্বারা হবে না, সেটাও ভাল করে বুঝতে পারে না। মেয়ের সম্পর্কে বলতে গিয়ে শেষ পর্যন্ত গুলিয়ে ফেলে।

এর থেকে নদী নিজে কথা বললে অনেক ভালো করে গুছিয়ে বলতে পারত। চাকরি করতে করতে নদী সেটা

ছোটবেলায় মানুষের অনেক অদ্ভুত অদ্ভুত ধারণা থাকে। বড় হওয়ার পর যেগুলো আস্তে আস্তে কেটে যায়। যেমন অনেকদিন অবধি নদীর ধারণা ছিল গুপি গাইন বাঘা বাইন সিনেমার গুপি আসলে রাসবিহারীবাবুই। তিনি গান গাইলে সবাই চুপ করে থেমে যাবে।

শিখে গিয়েছে। কী করে লোককে কনভিন্স করতে হয় তা নদী খুব ভাল করে জানে। কিন্তু এটা চাকরিক্ষেত্র নয়, এখানে তার কথা বলার নিয়ম নেই। নদী তাই চুপ করে থাকে, বাবাকেই কথা বলতে দেয়। বাবা গুলিয়ে ফেললে নদীরই সুবিধে। সে তো আর সত্যি সত্যি বিয়ে করতে চায় না।

আজ অবশ্য খুব বেশি লোক আসেনি। পাত্রের সঙ্গে এসেছে বাবার অফিসের সেই কোলিগ, যার ভালো নাম রাসবিহারীবাবু। এ ছাড়া আরও একজন। তিনিও বয়স্ক, মাথার চুল পাকা। মা যখন নদীকে শাড়ি পরিয়ে দিচ্ছিল তখন পুপু এসে অতিথিদের ব্যাপারে চুপিচুপি জানিয়ে গিয়েছে।

রাসবিহারীবাবুকে নদী চেনে। কালীঘাটের বাড়িতে তিনি মাঝেমাঝে রবিবার সকালে হুটহাট করে উদয় হতেন। এসে বলতেন, 'বউদি, চায়ের জল বসান। আপনার হাতের চা খাব।'

গড়িয়ার বাড়িতেও রাসবিহারীবাবু এসেছেন। তবে কম। কালীঘাটের বাড়িতে যাতায়াতের সুবিধে ছিল, এখানে নেই। তা ছাড়া চাকরি থেকে রিটায়ার করার পর অফিসের বন্ধন ক্রমে আলগা হয়ে যায়। রাসবিহারীবাবু রিটায়ার করার পরে বাড়ি করেছেন বেহালায়। গড়িয়া থেকে অনেক দূর। আগে তিনি থাকতেন রাসবিহারী অ্যাভিনিউয়ের মোড়ের কাছে একটা ভাড়া বাড়িতে। হেঁটে হেঁটে চলে আসতেন নদীদের বাড়িতে। খুব ছোটবেলায় নদীর ধারণা ছিল রাসবিহারীবাবুর নামেই রাসবিহারী অ্যাভিনিউয়ের নামকরণ হয়েছে।

ছোটবেলায় মানুষের অনেক অদ্ভুত অদ্ভুত ধারণা থাকে। বড় হওয়ার পর যেগুলো আস্তে আস্তে কেটে যায়। যেমন অনেকদিন অবধি নদীর ধারণা ছিল গুপি গাইন বাঘা বাইন সিনেমার গুপি আসলে রাসবিহারীবাবুই। তিনি গান গাইলে সবাই চুপ করে থেমে যাবে। নদীর কেন এই ধারণা ছিল তা সে নিজেই জানে না। রাসবিহারীবাবুর মুখে বসন্তের দাগ ছাড়া তাঁর সঙ্গে গুপির আর কোনও মিল নেই। বরং চেহারার দিক থেকে তাঁর সাদৃশ্য বাঘার সঙ্গেই বেশি। তা সত্ত্বেও রাসবিহারীবাবুকে মনে মনে গুপি ভাবত নদী। আড়ালে রাসবিহারীবাবুকে দুই বোন গুপিকাকু বলে রেফার করত।

গুপিকাকু এমনিতে বেশ আমুদে টাইপের মানুষ। হইহই করে জমিয়ে দিতে পারেন। কালীঘাটের বাড়িতে এসে হা হা করে উঁচুস্বরে হাসতেন। আজও হাসছেন তিনি। তাঁর হাসির সঙ্গে গলা মিলিয়েছে বাবাও। বাবা এমনিতে হাসে না বিশেষ। আজ হাসছে। নিজের অফিসের প্রাক্তন সহকর্মীকে দেখতে পেয়ে তার মেজাজ খোলতাই হয়েছে। যেন এক ধাক্কায় বয়স কমে গিয়েছে অনেকটা।

বাইরের ঘরের আওয়াজ নিজের ঘরে বসে কানে আসছে নদীর। তার একটু অদ্ভুত লাগছে। পাত্রী দেখতে এলে বসার ঘরের পরিবেশ গুরুগম্ভীর থাকে। আজ অন্যরকম। এতে নদীর অস্বস্তি হচ্ছে। এত হাসি-ঠাট্টা তার ভালো লাগছে না। পাত্রী দেখতে এসে এত হাসাহাসির কী দরকার? গম্ভীর হয়ে বসে গড়িয়া থেকে আনা স্পেশাল মিষ্টি আর বাড়িতে বানানো খাস্তা নিমকি খেয়ে বিদায় নিলেই হয়!

পুপু এসে খাটের পাশে দাঁড়াল। ফিসফিস করে বলল, 'মা প্লেট সাজিয়ে ফেলেছে। এবার তুই ওঘরে যাবি। খাবারের ট্রে হাতে নিয়ে। বুড়োদের হাসি দেখে মা-ও ঘাবড়ে গিয়েছে, বুঝলি?'

পুপু দিদির মুখটা হাত দিয়ে নিজের দিকে ঘুরিয়ে ভাল করে নদীকে পর্যবেক্ষণ করল। বলল, 'কী জানিস? তোর চোখ দু'টো অপূর্ব! দারুণ দেখাচ্ছে তোকে, চিন্তা করিস না একদম।'

'পাকামো করতে হবে না। আমি চিন্তা করছি না মোটেই।'

'মুখ ভেটকে রেখেছিস কেন তা হলে?'

'আমি মুখ ভেটকাইনি। বিরক্তি লাগছে। পাত্রী দেখতে এসে অত জোরে জোরে হাসার কী আছে? একটা ভদ্রতাবোধ নেই!'

'আহা গুপিকাকু তো সব সময়েই এ রকম হাসত। আজ হঠাৎ গম্ভীর হয়ে থাকবে?'

'তা বটে।'

'ছেলেটা কিন্তু চুপচাপ বসে আছে। দেখলে মনে হয় ভাজা মাছ উল্টে খেতে জানে না।'

'খাস্তা নিমকি উল্টে খেতে জানলেই হল! মিষ্টি তো চামচ দিয়ে কেটে খাবে।'

'হি হি হি হি। দেখতে ভালো কিন্তু, বুঝলি?'

'ভালো দেখতে ছেলেদের আমার পছন্দ হয় না। তোর পছন্দ হয়েছে নাকি?'

'হয়েছে।'

'বেশ। বলে দেব তাহলে। বলব ঘরে আরেকটি মেয়ে আছে, তার আপনাকে মনে ধরেছে। আমার বদলে ওকে বিয়ে করুন!'

'ধ্যাত!'

'ধ্যাত কেন? সিনেমায় তো এ রকম হামেশাই হয়। এক বোনকে দেখতে এসে অন্য বোনকে পছন্দ হয়ে গেল!'

'মোটেই হবে না। কোথায় তুই আর কোথায় আমি! চাঁদের সঙ্গে কীসের তুলনা, হি হি হি হি...'

বোনের মুখের দিকে তাকিয়ে হাসল নদী। থুতনিটা ধরে একটু নেড়ে দিয়ে বলল, 'এই বাড়ির চাঁদ তুই-ই। আমি হলাম কলঙ্ক, বুঝলি?'

ভুরু কুঁচকে পুপু তাকাল নদীর দিকে। বলল, 'তুই হচ্ছিস নদী। চাঁদের ছায়া পড়ে তোর জলে। তোর সঙ্গে আমার তুলনা?'

মা তাড়া দিতে চলে এসেছে ঘরে। নদীকে শাড়ি পরিয়ে দিয়ে মা ঘরে গিয়ে নিজেও ভদ্রস্থ শাড়ি পরে নিয়েছে। বাবা অনেকদিন পরে আবার প্যান্ট আর হাওয়াই শার্ট পরেছে। মা শাড়ি বদলেছে, কারণ গুপিকাকুকে কোনও বিশ্বাস নেই। হুটহাট 'কী বউদি কেমন আছেন' বলে ঘরের মধ্যে ঢুকে পড়তে পারে। গুপিকাকুর জন্যই মা শাড়ি

বদলেছে। হয়তো বসার ঘরে গিয়ে দাঁড়াবেও একবার। গুপিকাকুর প্রতি সৌজন্য দেখাতে। এমনিতে পাত্রী দেখতে এলে মা পারতপক্ষে বসার ঘরে যায় না। পাত্রীর মতো পাত্রীর মায়েরও এক ধরনের কুণ্ঠাবোধ থাকে।

মা বলল, 'নিমকিগুলো মাইক্রোআভেনে একটু গরম করে দিয়েছি। রসগোল্লাগুলোও গরম করে দিয়েছি। খেলে মনে হবে এই বুঝি বানানো হল। অনেকে গরম রসগোল্লা খেতে খুব ভালবাসে...'

নদী উঠে দাঁড়াল। এখন ট্রেতে করে তাকে খাবার সাজিয়ে নিয়ে বসার ঘরে ঢুকতে হবে। পাত্রী দেখতে এসে পাত্রপক্ষের জন্য ফ্রি সার্ভিস। পাত্রীকে এইটুকু করতেই হয়। পাত্রী কেমনভাবে খাবার সাজিয়ে দেয়, তা থেকে পাত্রীর লক্ষ্মীশ্রী বুঝে যায় অভিজ্ঞ পাত্রপক্ষ।

মা বলল, 'রাসবিহারীবাবু যদি গল্প করার জন্য তোকে বসতে বলে তাহলে ওখানেই থেকে যাবি। পুপু চা নিয়ে যাবে।'

নদী কিছু বলল না। গুপিকাকু গপ্পে মানুষ। নদীকে দেখে প্রত্যেকবারই অবাক হয়ে যান। প্রত্যেকবার বলেন, 'তুমি কত বড় হয়ে গেছ, অ্যাঁ। ভাবাই যায় না। তোমাকে আমি কতটুকু দেখেছি।'

সেটাই স্বাভাবিক। মানুষ যখন জন্মায় তখন তার আড়াই-তিন কেজি মতো ওজন থাকে। বড় হলে ওজন বাড়ে, চেহারাতেও বাড়ে। নদীও ব্যতিক্রম নয়। নদী যদি এখনও ছোট থাকত তাহলেই বরং গুপিকাকুর অবাক হওয়া উচিত ছিল। অথচ নদী বড় হয়েছে বলে গুপিকাকু অবাক হন প্রত্যেকবার।

ট্রেতে করে একেকটা প্লেটে দুটো করে নিমকি আর দুটো করে দু'ধরনের মিষ্টি সাজিয়ে দেওয়া হয়েছে। এ ছাড়া বড় বড় বসগোল্লা। গরম করা হয়েছে বলে রসগোল্লাগুলো একটু তুলতুলে মতো দেখতে হয়ে আছে।

পাত্র, গুপিকাকু, আর সাদা চুলের ওই ভদ্রলোক। তিনটে প্লেট। তিনটে প্লেটেই ট্রের ওজন বেশ বেশি। যখন অনেক লোক আসে পাত্রী দেখতে, তখন একবারে খাবার এনে দেওয়া যায় না। দু'বারে নিয়ে আসতে হয়। আজ সেই পরিশ্রম বেঁচে গিয়েছে নদীর।

ট্রে-টা বসার ঘরে নিয়ে যেতে যেতে মিষ্টির সাইজগুলো দেখে নিল নদী। ঢাউস সাইজের মিষ্টি একেকটা। কারও পক্ষে এই সাইজের এতগুলো মিষ্টি খাওয়া অসম্ভব। মিষ্টি দেখে স্বভাবতই সকলে আঁতকে ওঠে। তাড়াতাড়ি করে, 'ও বাবা এত কে খাবে' জাতীয় একটা রব ওঠে। যাঁদের বয়স একটু বেশি তারা আবার বলে ওঠেন, 'আমার তো সুগার মা, এত মিষ্টি কি আমি খেতে পারি?'

তা সত্ত্বেও মিষ্টি সাজিয়ে দেওয়াটাই শিষ্টচার। ভদ্রতা করে না খাওয়াটাও তাই। কেউ এত মিষ্টি খাবে না সবাই জানে, তবু বাবা বলবে, 'এ আর এমন কী! এইটুকু তো খেতেই হয়!'

তারপর পুপুকে রান্নাঘর থেকে প্লেট নিয়ে আসতে হবে। সেই প্লেটে সকলে তুলে দিতে থাকবে বাড়তি মিষ্টিগুলো। বাবা আবার বিনীতভাবে বলতে থাকবে, 'একী একী! কিছুই তো খাচ্ছেন না! সবই তুলে দিচ্ছেন!'

এ সবই শিষ্টাচারের অঙ্গ। মিষ্টি লোকে খেতে চায় না, তা সত্ত্বেও প্লেটে সাজিয়ে মিষ্টি দেওয়া। চা দেওয়ার সময়ে জিজ্ঞেস করা কার চায়ে কত চিনি হবে। দেওয়ার সময়ে আবার বিভিন্ন চিনির পরিমাপ করা চায়ের কাপ গুলিয়ে যায়। এর চা ওর চা গন্ডগোল হয়ে যায়। তাও লোকে শিষ্টাচার মেনে তা নিয়ে কিছু বলে না। হাসি হাসি মুখ করে ভুল মাপের চিনি দেওয়া চা খেয়ে নেয়।

পাত্রপক্ষের হাতে প্লেট তুলে দেওয়ার একটা নিয়ম আছে। প্রথমে বয়স্কদের হাতে খাবার প্লেট তুলে দিতে হয়, তারপর দিতে হয় কমবয়সিদের। একেবারে শেষে যে হবু জামাই, তার হাতে। এতে বোঝা যায় হবু বউ বয়স্কদের সম্মান করতে জানে, বিয়ে হলে শ্বশুরবাড়িতে গিয়ে শাশুড়ির সঙ্গে ঝগড়া লাগিয়ে দেবে না। নদীকে এ সব নিয়মের কথা মা পইপই করে মনে করিয়ে দেয়। আজও দিয়েছে। নদী শুনে নিয়েছে সে সব, ঘাড়ও নেড়েছে।

পায়ে পায়ে ট্রে হাতে বসার ঘরে এসে দাঁড়াল নদী। ভারী ট্রে নিয়ে হাঁটার বিপদ আছে। সব সময়ে সতর্ক থাকতে হয়। ট্রে কাত হলে চলবে না। মিষ্টি আর নোনতা মাখামাখি হলে চলবে না। সেটা খুব খারাপ ব্যাপার। এই ভাবে ট্রে নিয়ে হাঁটা সামনের দিকে ঝাঁকানো রিকশায় বসার থেকেও রিস্কি। মুখ নামিয়ে মিষ্টির দিকে তাকিয়ে থাকতে হয় মন দিয়ে। দু'হাত যেহেতু আটকানো, তাই চোখ দিয়েই মিষ্টিগুলোকে মনে মনে বকাবকি করতে হয়। তাদের বলতে হয়, 'চুপ করে বসে থাক, একদম অসভ্যতা করবি না। হুড়মুড়িয়ে নিমকির গায়ে গিয়ে পড়বি না!'

নদী ঘরের দরজায় এসে দাঁড়াতেই তিন জোড়া চোখ একেবারে নদীর দিকে। তার মধ্যে গুপিকাকুর চোখে প্রচ্ছন্ন স্নেহ। সেটাই স্বাভাবিক, নদীকে তিনি অনেকদিন ধরে চেনেন। অন্য বয়স্ক মানুষটার চোখে কৌতূহল। কিন্তু সেই দৃষ্টিও খারাপ কিছু না। আর জিন্স আর নীল রঙের শার্ট পরা ছেলেটির চোখ একটু লাজুক। কোনও রকমে একঝলক নদীকে দেখে নিয়েই তার দৃষ্টি আবার মাটির দিকে নিবদ্ধ। এত বয়স্কজনের মাঝে এমনিতেই ছেলেটি একটু অস্বস্তিতে। এখন কমবয়সি একটি মেয়ের এই ঘরে আগমনে তার অস্বস্তি বাড়ছে বই কমছে না।

বাবা এমনিতে পাত্রপক্ষের সামনে খুব টেনশন করে। আজ তার মুখটা হাসি হাসি। এতক্ষণ ধরে গুপিকাকুর সঙ্গে হাসাহাসির রেশ বাবার মুখে রয়ে গিয়েছে।

নদীকে দেখে বাবা স্মিতমুখে বলল, 'আয় মা, আয়। তুমি তো চেনোই রাসবিহারী, তোমাকে আর নিজের মেয়ের কথা কী বলব!'

গুপিকাকু বললেন, 'এসো নদী! তোমাকে অনেকদিন পরে দেখলাম। কত বড় হয়ে গেছ, অ্যাঁ!'

নদী হাসল। ট্রে-টা সেন্টার টেবিলে নামিয়ে রাখতে রাখতে বলল, 'আপনি কিন্তু একেবারে বদলাননি। সেই একই রকম আছেন!'

ট্রে-টা বসার ঘরে নিয়ে যেতে যেতে মিষ্টির সাইজগুলো দেখে নিল নদী। ঢাউস সাইজের মিষ্টি একেকটা। কারও পক্ষে এই সাইজের এতগুলো মিষ্টি খাওয়া অসম্ভব। মিষ্টি দেখে স্বভাবতই সকলে আঁতকে ওঠে।

রসগোল্লার রস চিপে ফেলে দেন কি না সেটা নদী টুক করে দেখে নিল। রস চিপলে নিমকির সঙ্গে মাখামাখি হয়ে যাবে। তখন খাস্তা নিমকি আর খাস্তা থাকবে না। মা'র হাতে বানানো সাধের খাস্তা নিমকি।

গুপিকাকু একটু গর্বিত ভাবে তাকালেন বাবার দিকে। বললেন, 'শুনলে তো? রিটায়ার করলেও জীবনটা ফুরিয়ে যায় না। আমি এখনও প্রাণায়াম করি রীতিমতো! সকালে উঠে কল-ওঠা কাঁচা ছোলা, তারপর সেই ছোলা হজম করার জন্য এক ঘণ্টা প্রাণায়াম। প্রাণায়ামের কোনও বিকল্প হয় না, তোমায় সেই কবে থেকে বলেছি বারিদ!'

গুপিকাকুর কথায় ছেলেটা মুখ তুলে তাকিয়ে মিটিমিটি হাসছে। নদীর সঙ্গে চোখাচুখি হতেই আবার টুক করে মুখ নামিয়ে নিয়েছে। পুপু ঠিকই বলেছে। ছেলেটাকে দেখতে ভালো। চোখগুলো বড় বড়। গালে এক দিনের না-কামানো দাড়ি। হাল্কা দাড়িটা মুখের সঙ্গে মানিয়েছে বেশ। একটু বাচ্চা বাচ্চা মুখ। মাছ ভাজা দিলে হয়তো সত্যিই উল্টে খাবে না। একদিক খেয়ে রেখে দেবে।

সব থেকে ভালো কথা ছেলেটার গোঁফ নেই। গোঁফওয়ালা ছেলেদের নদীর একদম পছন্দ হয় না, গোঁফ জিনিসটা দেখলেই নদীর গা শিরশির করে। মনে হয় নাকের তলায় শুঁয়োপোকার মতো। হঠাৎ করে এদিক ওদিক হাঁটা দেবে। কিংবা নাকের ফুটোর মধ্যে ঢুকে যাবে। হাল্কা দাড়ি ব্যাপারটা কিন্তু খারাপ নয়। ওটাই আজকের স্টাইল, এতে ছেলেদের ভালো দেখতে লাগে। গোঁফ না থাকা সত্ত্বেও বেশ একটা পুরুষালি ব্যাপার ফুটে বেরোয়। নদীর খুব ইচ্ছে উপলও ওরকম একটা হাল্কা দাড়ি রাখুক। কিন্তু সেটা সম্ভব নয়। কর্পোরেট জগতে ক্লিন শেভেন হয়ে কাজ করতে আসার নিয়ম। উপলের গাল সে কারণে মেয়েদের মতো চকচক করে।

ট্রে-টা সেন্টার টেবিলে নামিয়ে রেখে সামান্য একটু সমস্যায় নদী। সাদা চুলের বয়স্ক ভদ্রলোক নদীর থেকে একটু দূরে, গুপিকাকু বাবার সঙ্গে আড্ডা মারার জন্য পা তুলে বসে রয়েছে ডিভানের উপরে। সব থেকে কাছে পাত্রটি, নদীর পক্ষে তাকেই খাবারের প্লেট আগে বাড়িয়ে দেওয়াটা সুবিধেজনক।

'নিন ধরুন,' প্লেটটা বাড়িয়ে ধরেছে নদী।

ছেলেটি মুখ তুলে তাকিয়েছে। তার অস্বস্তি যেন আরও বেড়েছে। মিষ্টির সাইজ দেখে তার চোখও মিষ্টির মতোই বড় বড় হয়ে উঠতে চাইছে।

'ধরুন। প্লেটে যা আছে সব খেয়ে নেবেন। কিচ্ছু ফেলবেন না। আমাদের বাড়িতে ফ্রিজ নেই, না খেলে নষ্ট হবে। খাবার নষ্ট করা ঠিক না।'

হা হা করে হেসে উঠলেন গুপিকাকু। বাবা হাসবে কি না ঠিক বুঝতে পারছে না। পাত্রপক্ষের সামনে নদী হঠাৎ করে কথা বলে উঠবে বাবা ভাবতে পারেনি।

গুপিকাকু বললেন, 'খেয়ে নাও ঈশান। এই তো খাওয়ার বয়স। আর তুমিও প্রাণায়াম করতে পার তো! হজমশক্তি বাড়ে।'

ঈশান। নামটা ভাল। ঈশান কোণে মেঘ জমলে নদী ফুলে-ফেঁপে ওঠে। জলের ঢেউ হঠাৎ করে বেড়ে যায়। মাঝিমাল্লারা নৌকো সামলানোর জন্য ব্যস্ত হয়ে ওঠে।

'নিন ধরুন।'

ছেলেটার আর উপায় নেই কোনও। কোনওরকমে কুণ্ঠিতভাবে হাত বাড়িয়ে দিয়েছে, প্লেটের এত খাবার সামলাবে কী করে ভাবছে মনে মনে। ছেলেটার অবস্থা দেখে নদীর হাসি পাচ্ছে। কিন্তু হাসা চলবে না। হাসলেই পরিস্থিতি লঘু হয়ে যাবে। পাত্রপক্ষের সামনে অযাচিতভাবে হাসতে নেই। তাতে পাত্রীকে লোকে চপলা ভাবে, পাত্রীকে একমাত্র দাঁতের সেটিং কেমন সেটা দেখানোর জন্য হাসতে হয়। মাপমতো হাসি।

সাদা চুলের ভদ্রলোক খাবার নিয়ে কোনও সমস্যা করলেন না। হাত বাড়িয়ে প্লেটটা নিলেন। মিষ্টির পরিমাণ নিয়েও তাঁর কোনও আপত্তি নেই। অনেকে থাকেন যাঁরা মিষ্টি খেতে ভালবাসেন। বিয়েবাড়িতে গিয়ে একান্নটা রসগোল্লা খেয়ে রেকর্ড স্থাপন করার গল্প রসিয়ে বলতে ভালোবাসেন। এঁরা সাধারণত রসগোল্লা খান রসটা একটু চিপে নিয়ে। বেশি রস খেলে পেট ভরে যায় তাড়াতাড়ি। এই ভদ্রলোক হয়তো সে রকম। ছোটবেলায় রসগোল্লা খাওয়ার রেকর্ড আছে। এখনও মিষ্টি পেলে ছাড়েন না।

রসগোল্লার রস চিপে ফেলে দেন কি না সেটা নদী টুক করে দেখে নিল। রস চিপলে নিমকির সঙ্গে মাখামাখি হয়ে যাবে। তখন খাস্তা নিমকি আর খাস্তা থাকবে না। মা'র হাতে বানানো সাধের খাস্তা নিমকি। সেগুলো জিবেগজা হয়ে যাবে। ভদ্রলোক রস চিপলেন না। একটা রসগোল্লা চামচে করে নিয়ে টুক করে মুখে পুরে ফেললেন। একবারে। নদী নিশ্চিন্ত হল।

গুপিকাকুর খাওয়াদাওয়ার ব্যাপারে কোনও 'না' নেই কখনও। কোনও আদিখ্যেতাও নেই। 'এই খাব না', 'সেই খাব না' বলে কোনও প্যাখনা নেই। যা দেওয়া হবে তাই খেয়েই গুপিকাকু সবসময়ে উচ্ছ্বসিত। আসলে যে কোনও জিনিসই কাঁচা ছোলার থেকে খেতে ভালো বোধহয়।

প্লেটের দিকে তাকিয়ে গুপিকাকু বললেন, 'নিমকিগুলো নিশ্চয় বউদির বানানো! বউদির হাতের নিমকি, কোনও কথা হবে না ঈশান। কী বলছি খেলেই বুঝতে পারবে। আমি কি আর এমনি এমনি তোমায় এই বাড়িতে টেনে এনেছি? আমার নিজেরই নিমকি খাওয়ার লোভ হচ্ছিল, হা হা হা হা...'

ঈশান মুখ তুলে হাসল। সেই সঙ্গে টুক করে একবার নদীর দিকেও তাকিয়ে দেখে নিল। হাসলে ছেলেটাকে ভালো দেখায়। ক্যালানে-কার্তিক বলে মনে হয় না। কী যেন একটা আছে ছেলেটার মধ্যে। হাসলে মনে হয় আপনজন।

নদী বলল, 'আমি চা নিয়ে আসি। আপনাদের সবার দুধ-চা তো?'

গুপিকাকু বললেন, 'চা আনতে পরে যেও। আগে বোসো তো এখানে। তোমার সঙ্গে গল্প করি আগে।'

ঈশান বলল, 'আমার জন্য চা আনবেন না। আমি চা খাই না।'

ক্যালানে-কার্তিকই। নদী এবার নিশ্চিন্ত হল। এই বয়সেও চা খায় না। ফিক করে হেসে নদী বলল, 'আপনি দুধ খাবেন?

ক্যান্সার
মানেই মৃত্যু নয়

প্রাচীন আয়ুর্বেদিক চিকিৎসায় ভালো থাকুন ক্যান্সারেও

বিগত চার দশকেরও বেশি সময় ধরে নিরন্তর গবেষণা ও অনলস প্রচেষ্টার মাধ্যমে ডি. এস. রিসার্চ সেন্টার ক্যান্সারের চিকিৎসায় এমন এক বিকল্প পথের সন্ধান দিয়েছে যা একই সাথে নিরাপদ, সাশ্রয়কর এবং যন্ত্রণাহীন। প্রাচীন আয়ুর্বেদিক মতে মানবীয় ভোজ্য পদার্থ থেকে সংগৃহীত পোষক শক্তির এই চিকিৎসা, ক্যান্সারের বিরুদ্ধে লড়াইয়ে এগিয়ে রাখে মানুষকেই। একেবারে শুরুর দিন থেকেই সংস্থার অভিজ্ঞ আয়ুর্বেদাচার্য, ডায়াটেশিয়ান এবং অঙ্কোলজিস্টরা সর্বদাই মানুষের পাশে থেকে, তাঁদের এই মারণব্যাধির বিরুদ্ধে লড়তে সাহায্য করেন।

"ব্যয়সাধ্য চিকিৎসায়, শরীরের সাথে আমার পরিবারের আর্থিক অবস্থারও অবনতি হচ্ছিল, যা আমাকে আরও ভাবিয়ে তুলেছিল।"

প্রকাশ মিশ্র
পাটনা, বিহার
ক্যান্সারের ধরন - **নন-হজকিন্স লিম্ফোমা**
চিকিৎসার কাল - ২০০০-২০০১

ক্যান্সার যে কাউকে রেয়াত করে না তার আভাস পেলাম যখন এই মারণব্যাধি আমাকেই আক্রমণ করে বসল। পলকে পরিস্থিতি বদলে গিয়ে নিদারুন শারীরিক ও মানসিক যন্ত্রণার শিকার হয়ে পড়লাম। ব্যয়সাধ্য চিকিৎসায় আমাদের জমারাশিও প্রায় তখন শেষের পথে। তখনই এক বন্ধুর কাছে ডি.এস. রিসার্চ সেন্টার এবং তাদের ব্যতিক্রমী চিকিৎসার কথা জানতে পারি। ভগবানকে ধন্যবাদ, শেষ পর্যন্ত আমি নিউট্রিয়েন্ট এনার্জি ট্রিটমেন্টে ভরসা রেখেছিলাম। মাত্র তিন মাসের চিকিৎসায় আমার শারীরিক অবস্থার আমুল পরিবর্তন হয়। যন্ত্রণাহীন এই চিকিৎসার কোনও পার্শ্বপ্রতিক্রিয়া নেই এবং চিকিৎসার খরচও একেবারে সাধারণ মানুষের আয়ত্তের মধ্যে। ক্যান্সারকে পরাস্ত করে মনে হয় নতুন জীবন পেলাম। ধন্যবাদ ডি. এস. রিসার্চ সেন্টার।

বিগত ১২ বছর আমি একেবারেই স্বাভাবিক ও স্বচ্ছন্দ জীবনযাপন করছি।

কয়েকজন ক্যান্সার বিজয়ীর তালিকাঃ

মায়া আশ (CA Stomach & Pancreas), হাওড়া, পশ্চিমবঙ্গ | মমতা ওঝা (CA Ovary), মেদিনীপুর, পশ্চিমবঙ্গ | বিজলী দে (CA Breast & Bone), রামপুরহাট, পশ্চিমবঙ্গ | মোজাম্মেল হোসেন (CA Prostate), ঢাকা, বাংলাদেশ | সুপর্ণা বড়ুয়া (Multiple Myloma), চট্টগ্রাম, বাংলাদেশ | সুধা আর. (NHL), কুমটা, মুম্বই | দিবাকর শ্রীবাস্তব (CA Bone), মুম্বই | সন্ধ্যা শর্মা (CA Astrocytoma / Brain), মুম্বই | ভাস্করণ (CA Lungs Met. Brain), চেন্নই | মোহনলাল জৈন (CA Hyprotics Phyryform Phosa), চেন্নই | শ্রীনিবাস শেষাদ্রি (CA Oral Mucosa), শাস্ত্রীনগর, চেন্নই | গণেশ জৈন (CA Astrocytoma, Glucoma), চিকপেট, বেঙ্গালুরু | অনিল শ্রীবাস্তব (AML), অমেথি, উত্তরপ্রদেশ | রীতা সিং (ICL), বারাণসী এবং আরও অনেকে...

D.S. Research Centre
LET US SAVE OUR WORLD FROM CANCER
An "ISO 9001:2008" Organisation

P - 26, C.I.T. Road, Scheme - VI M, Opp. Kankurgachi Pantaloons, Kolkata - 700 054
Ph: + 91 33 40164141
E-mail: dsrckolkata@gmail.com, Website: www.dsresearchcentre.com

Our Clinics: Bengaluru | Guwahati | Kolkata | Mumbai | Silchar | Varanasi

Find us on:

megaminds.in

পাত্রপক্ষ চলে গিয়েছে অনেকক্ষণ। তারপর প্রতি রবিবারের মতো তাড়াতাড়ি করে খেয়ে নিয়েছে নদী। খাওয়াদাওয়ার পরে একবার ছাদের ঘরে গিয়েছিল। অসম্পূর্ণ ঘর, কিন্তু এখানে প্রাইভেসি আছে।

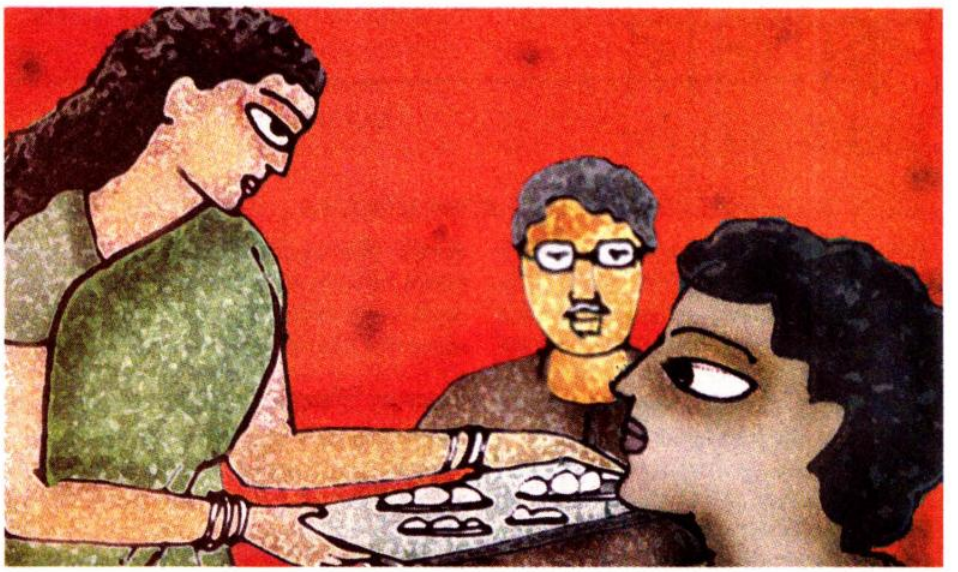

দুধ আছে। আমাদের বাড়িতে কেউ চায়ের সঙ্গে ছাড়া দুধ খায় না তো, তাই দুধ জমে যায়। মা ঘন করে জাল দিয়ে রাখে। খাবেন?'

নদীর এই কথাটা বলা উচিত হয়নি। অপরিচিত লোকের সামনে এ রকম কথা বললে বাচাল বলে। তবু নদী সামলাতে পারেনি, মুখ ফস্কে কথাটা বেরিয়ে গিয়েছে অতর্কিতে। কিছু কথা থাকে যা মানুষ সামলাতে পারে না। কিছু ভেবে ওঠার আগেই মুখ থেকে ছিটকে বেরিয়ে যায়। আর বেরিয়ে গেলে সেটাকে আর ফিরিয়ে নেওয়ার উপায় নেই। অনেকটা টুথপেস্টের মতো। বেরিয়ে গেলে আর টিউবের মধ্যে ঢোকে না।

বাবার মুখটা গম্ভীর হয়ে গিয়েছে। রাসবিহারীবাবুও কী বলবেন বুঝে উঠতে না পেরে চুপ করে গিয়েছেন। আর সাদা চুলের ভদ্রলোক বিষম খেয়ে একটু কেশে উঠলেন খুক খুক করে। ছেলেটা কিন্তু তাকিয়ে আছে নদীর দিকে। তার চোখে হাসি ঝিলিক দিচ্ছে। নদীর কথায় সে ক্ষুব্ধ হয়নি। বরং মজা পেয়েছে বেশ।

ছেলেটা বলল, 'আমি দুধও খাই না। দুধ খেলে আমার অ্যালার্জি হয়। আমি ল্যাকটোফোবিক। একমাত্র দুধের মিষ্টি হজম হয়। আর দই। এই মিষ্টিগুলো ভাল।'

'দই নেই। পরের দিন এলে দই এনে রাখব। মা বাড়িতেও দই পাতে। মিষ্টি খাবেন আরও? এনে দেব?'

'না না, উরিব্বাস! এত খাবার কে খাবে?'

ডিভানের ওপর বাবা শক্ত করে বসেছিল। এখন বাবার মুখটা নরম হয়ে উঠেছে। গুপিকাকুও সামলে গিয়েছেন। সাদা চুলের ভদ্রলোকের খুকখুকে কাশি থামেনি এখনও। মিষ্টির টুকরো বেয়ারাভাবে ঢুকে পড়েছে শ্বাসনালীর মধ্যে।

নদী বলল, 'আমি জল নিয়ে আসি, এক মিনিট।'

ভদ্রলোক ঘাড় নাড়লেন।

নদী ভিতর থেকে জল আনতে আনার ফাঁকে রাসবিহারীবাবু বললেন, 'এ একদিক থেকে ভালোই হল। ছেলে-মেয়ে নিজের মধ্যে কথাবার্তা বলে নিলে ঝামেলা সব থেকে কম। বিয়ে তো ওরা করবে, আমাদের আর এর মধ্যে নাক গলানোর কী আছে? তোমার মেয়েটা কিন্তু স্মার্ট হয়ে উঠেছে বারিদ, 'অ্যাঁ! কী হল ঈশান, তোমাকেও ঘাবড়ে দিয়েছিল তো!'

রবিবার বেশি রাত করতে চায় না নদী। সারা সপ্তাহ তার পরিশ্রম যায়, রবিবার দুপুরে ঘুমোলেও সন্ধের পর থেকে তার চোখ আবার ঘুমে ঢুলে আসতে থাকে। আজ আবার দুপুরে ভালো করে ঘুম হয়নি, বিকেলের পরেই পাত্র আসবে বলে আগেভাগে ঘুম থেকে উঠে পড়তে হয়েছিল।

পাত্রপক্ষ চলে গিয়েছে অনেকক্ষণ। তারপর প্রতি রবিবারের মতো তাড়াতাড়ি করে খেয়ে নিয়েছে নদী। খাওয়াদাওয়ার পরে একবার ছাদের ঘরে গিয়েছিল। অসম্পূর্ণ ঘর, কিন্তু এখানে প্রাইভেসি আছে। সেলফোন থেকে উপলকে ফোন করেছিল। উপল ফোন ধরেনি। উপল চায় না নদী তাকে রবিবার ফোন করুক। রবিবার ফোন করলে তার অসুবিধে হয়।

তা সত্ত্বেও নদী ফোন করেছিল। মনে হচ্ছিল উপলের সঙ্গে কথা বলা দরকার। তাকে জানানো দরকার আজ নদীকে পাত্রপক্ষ দেখতে এসেছিল। পাত্রের সঙ্গে অবশ্য যথেচ্ছ ইয়ার্কি মেরেছে সে, পাত্রপক্ষ মনে হয় তার ব্যাপারে আর খোঁজখবর নেবে না। যে মেয়ে ইয়ার্কি মারে, তাকে কেউ ঘরের বউ করে না।

উপলের সঙ্গে কথা না বলতে পেরে নদীর মেজাজ খারাপ হয়েছে। উপলটা অদ্ভুত। নিজের ইচ্ছে বলে নদীকে তার তক্ষুণি চাই, নদী ফোন করলে ফোন ধরারও প্রয়োজন মনে করে না। নদী ব্যবহার্য কমোডিটি, যখন খুশি তাকে ব্যবহার করে আবার ভুলে যাওয়া যায়! আশ্চর্য! ❖ *অলঙ্করণ : দেবযানী*

বসন্ত উৎসব

ঋতব্রত ভট্টাচার্য

প্রিয়জনের শরীরে একটা গন্ধ থাকে। সে গন্ধ বুঝতে পারে একমাত্র সে-ই, যে কিনা সেই শরীর আর মনকে অনুভব করেছে। বিকেল আর সন্ধের আশ্চর্য সেই সন্ধিক্ষণে চোখ বন্ধ করা অবস্থায় খাটে শুয়ে মোহনার উপস্থিতি টের পেল অগ্নি।

নয়

শেষ দুপুরে অসময়ে খাওয়ার পর খাটে একটু গড়িয়ে নিতে গিয়ে কখন যে চোখ লেগে গিয়েছিল অগ্নির। এটা অগ্নির প্রায়ই হয়। রোজ রাতে বই নিয়ে শোয়া অভ্যেস তার। ছোটবেলা থেকেই ঘুমোতে যাওয়ার সময় তার বই চাই। ছেলেবেলার কিছু অভ্যেস সারা জীবন থেকে যায়। আজও বইয়ের পাতার বর্ণমালা দেখতে দেখতে প্রতি রাতে কখন যে তার চোখের পাতায় ঘুম নেমে আসে—তার হিসেব সে নিজেই রাখতে পারে না। এমনও কখনও কখনও

সন্ধ্যাবেলায় উপাসনা গৃহের আলো প্রতিফলিত হচ্ছে ঝলমলে রঙিন সব কাচে। সেই পবিত্র আলো এসে পড়েছে উপাসনা গৃহের নীচের রাস্তায়। বড় পবিত্র সে আলো। সেই আলো গায়ে মেখে দাঁড়িয়ে রয়েছে দুই যুবক- যুবতী।

হয়েছে আধো ঘুমে সে ভাবছে সত্যিই কি সে ঘুমিয়ে পড়েছে না জেগে আছে!

চোখের পাতা বন্ধ অবস্থায় সে শুনতে পেল বেডসাইড টেবিলে চায়ের পেয়ালা রাখার শব্দ। তারপর ঘর জুড়ে মোহনার প্রাণবন্ত হাসি ছড়িয়ে পড়ল। 'আমি জানি একজন কিন্তু ঘুমোয়নি।' বাচ্চাদের মতো আধো গলায় বলে উঠল মোহনা। চোখ বন্ধ অবস্থায় শিউরে উঠল অগ্নি। ঘরে সুস্মিতা আছে জেনেও কী পাগলামো করছে মোহনা? মাঝে মধ্যেই অবশ্য মোহনা এমন করে। হঠাৎ ভীষণ আদুরে আর বাচ্চা হয়ে ওঠে। তখন এমন আহ্লাদি কথা বলে ওঠে সে! কিন্তু তখন তো শুধু ওরা দু'জনে থাকে। এমন কথার ঢং তো শুধু ওদের দু'জনের... হঠাৎ কী হল মোহনার!

হঠাৎ-ই মোহনা খাটে উঠে পড়ল। চোখ খুলে অগ্নি দেখল মোহনা জড়িয়ে ধরেছে ছোট্ট সুস্নাতকে। পাশে সুস্মিতা। ওহ্! তাহলে এতক্ষণ মোহনা সুস্নাতর সঙ্গে রসিকতা করছিল। হাঁফ ছেড়ে বাঁচল অগ্নি। মোহনা অগ্নির-দিকে তাকিয়ে বলল, 'বেশ তো নাক ডাকিয়ে ঘুমোচ্ছিলে।'

— তোমরা ঘুমোওনি?

— হ্যাঁ, দেখলাম সবাই খেয়ে দেয়ে ঘুমোচ্ছে। আমি ড্রইং রুমে বসে তোমাদের পাহারা দিচ্ছিলাম। নাও তোমরা চা খেয়ে নাও।

সুস্মিতা বলে উঠল—মোহনাদি, তুমি বলেছিলে আজ সেই জাঙ্ক জুয়েলারির দোকানে নিয়ে যাবে।

— যাব। তুমি আর আমি। আসার পথে আমার হোস্টেল 'কলকাকলি' ঘুরে আসব।

একদা মোহনার হোস্টেল 'কলকাকলি' তে নিজের ঘরে শুয়ে শুয়ে তখন শুভশ্রী ভাবছে সকাল থেকে টিভির পাল্লায় গোটা দিনটা কেমন কেটে গেল। সে কি কখনও ভেবেছিল ওর প্রিয় টিভি সাংবাদিক ঋতৃণের সঙ্গে এমন ভাবে পরিচয় হবে! সকালে পশালফুল নিয়ে যা হল... মনে পড়ে গেল ওর ঋতৃণের ভাষায় 'পলাশ নিয়ে ব্যাটেল অফ পলাশি'... ছেলেটা কথা বলে বেশ। মাঝে মধ্যেই শুভশ্রীর মোবাইলে এসএমএস আসছে। আত্মীয়স্বজন, চেনা-পরিচিতরা যারা ওকে টিভির পর্দায় দেখেছে, খুশি হয়ে ওকে জানাচ্ছে। হঠাৎ-ই শুভশ্রীর মনে হল এতক্ষণ ঋতৃণের সঙ্গে কথা হল, ওর মোবাইল নম্বরটা তো নেওয়া হয়নি। ইস্! নম্বরটা নিলে হত। হয়তো কোনওদিনই ফোন করত না। তবু থাকত।

আর কী কখনও কবে এমনও সন্ধ্যা হবে

ধীরে ধীরে শান্তিনিকেতনে সন্ধ্যা নামল। অন্ধকারে এক অপূর্ব আলোয় উপাসনা মন্দির আলোকিত। এই উপাসনা গৃহের কত ঐতিহ্য! শান্তিনিকেতন বাড়ির উত্তর-পূর্ব কোণে দেবেন্দ্রনাথ ঠাকুরের পরিকল্পনায় তৈরি ব্রহ্ম- উপাসনার মন্দির। যদিও মহর্ষিদেব বয়সের ভারে ১২৯০ সালের পর আর এখানে আসতে পারেননি। তাঁর সাত বছর পর ১২৯৭ সালে অগ্রহায়ণের বাইশ তারিখে উপাসনা মন্দিরের ভিত্তি স্থাপিত হয়। ভিত্তি স্থাপন করেছিলেন দেবেন্দ্রনাথ ঠাকুরের বড় ছেলে দ্বিজেন্দ্রনাথ ঠাকুর। সত্যেন্দ্রনাথ এই উপাসনা মন্দির স্থাপন নিয়ে বক্তৃতা করেছিলেন। আর স্বয়ং রবীন্দ্রনাথ সেদিন ব্রহ্মসঙ্গীত গেয়ে শুনিয়েছিলেন। এ সব কথা শুনলে মনে হয় কবেকার কথা। কত ঘটনার সাক্ষী এই প্রার্থনা গৃহ! সুদূর কাল থেকে আজ পর্যন্ত শান্তিনিকেতনের জীবনের গভীরে একটি বিশেষ জায়গা রয়েছে এর। রবীন্দ্রনাথ শান্তিনিকেতনে থাকলে প্রতি বুধবার সকালে অথবা সন্ধ্যায় উপাসনার আয়োজন হলে আচার্যের আসন গ্রহণ করতেন। সত্যের কথা সরলভাবে বলতেন গুরুদেব। আজও প্রতি বুধবার সকালে আচার্য পদে ওইদিন কোনও যোগ্য ব্যক্তি বসেন। উপনিষদের মন্ত্র উচ্চারিত হয়, বিভিন্ন ভবনের ছাত্র-ছাত্রীরা রবীন্দ্রসঙ্গীত পরিবেশন করেন। সন্ধ্যাবেলায় উপাসনা গৃহের আলো প্রতিফলিত হচ্ছে ঝলমলে রঙিন সব কাচে। সেই পবিত্র আলো এসে পড়েছে উপাসনা গৃহের নীচের রাস্তায়। বড় পবিত্র সে আলো। সেই আলো গায়ে মেখে দাঁড়িয়ে রয়েছে দুই যুবক- যুবতী। নন্দনতত্ত্ব- কলা-স্থাপত্যের আলোচনায় তারা মশগুল। নীল যতই অভিষিক্তার সঙ্গে কথা বলছে ততই যেন অবাক হয়ে যাচ্ছে। এত গভীরতা! এত কৌতূহল! এত জানার ইচ্ছে শান্তিনিকেতন নিয়ে? কথা বলতে বলতে ওরা এগিয়ে চলেছে। বড় রাস্তার দিকে। সেখানেই পার্ক করা রয়েছে ওদের গাড়ি। ঠিক সেই সময় সাইকেল চেপে ওদের সামনে হাজির হল কলা ভবনের অনির্বাণ আর অনিরুদ্ধ। নীলের সঙ্গে অভিষিক্তাকে দেখে একটু অবাকই হল ওরা। আগে কখনও ওরা তাকে দেখেনি। নীলই অভিষিক্তার সঙ্গে ওদের পরিচয় করিয়ে দিল। অনির্বাণরা অবশ্য বেশিক্ষণ দাঁড়াল না। ওদের তাড়া ছিল। যাওয়ার সময় অবশ্য ওরা নীলকে মনে করিয়ে দিল আজ সানন্দার বাড়ি কাকিমা ওদের সবার জন্য বিশেষ পদ রান্না করেছে। সঙ্গে আড্ডা। নীল যেন যায়। অভিষিক্তাকেও ওরা নেমন্তন্ন করে গেল। শান্তিনিকেতনে এটা বেশ লাগল অভিষিক্তার। অন্যের বাড়িতেও ক্ষণিকের পরিচয়ে কত আন্তরিকতার সঙ্গে একজন আরেকজনকে আমন্ত্রণ জানাল। উপাসনা গৃহের পবিত্র আলো পিচের রাস্তায় এসে পড়েছে। চারিদিক স্তব্ধ। দূরে সাইকেলের বেলের আওয়াজ ভেসে আসছে। হঠাৎ অভিষিক্তার দারুণ ভালো লাগল। মনে হল, সত্যি সে একটা তীর্থক্ষেত্রে এসেছে। যেখানে মানবতা আছে। আছে শান্তি। নীল অভিষিক্তাকে বলল, 'এক জায়গায় চলুন, আপনাকে ভালো চা খাইয়ে নিয়ে আসি।'

—কোথায়?

—চলুন না। দেখবেন।

তিন পেগ কখন যে উড়ে গেল টের পেল না তৃণা। অনর্ঘ্য সেই কখন থেকে মদ্যপান শুরু করেছে। এই দুনিয়াতে দুই ধরনের মদ্যপায়ী মানুষ আছেন। একদল মানুষেরা যখন তখন মদ্যপান করতে পারেন। স্থান, কাল, পাত্র কিছুতেই তাদের কিছু এসে যায় না। আবার এমন অনেকে আছেন যারা সঙ্গী

ছাড়া সুরাপানে আনন্দ পান না। অনর্ঘ্য শেষোক্তদের দলে। প্রথমে তৃণা রাজি হচ্ছিল না। মন মেজাজ তার ভালো নেই। বারবার অনর্ঘ্যর অনুরোধ শুনতে শুনতে এক সময় বিরক্ত হয়েই গ্লাসটা তুলে নিয়েছিল। অনর্ঘ্যকে দেখলে বোঝা যাচ্ছে এবার নেশাটা ওকে বেশ ধরেছে।

খাটে বসে তৃণাকে একদৃষ্টিতে দেখছে অনর্ঘ্য। শার্টের সামনের দুটো বোতাম কখন খুলে গিয়েছে। সেখান থেকে বিপজ্জনক ভাবে তৃণার বুকের খাঁজ ফুটে উঠেছে। তৃণার চুল খোলা। ওর চোখ দুটো যেন অনর্ঘ্যকে কাছে ডাকছে।। হঠাৎ-ই তৃণার ওপর ঝাঁপিয়ে পড়ল অনর্ঘ্য। মনে হল তৃণাকে কাছে টেনে পিষে ফেলবে। অদ্ভুত এক কামনায় মোড়া তৃণার শরীর। তৃণা প্রথমে অনর্ঘ্যকে বাধা দিল। অনর্ঘ্য তখন উন্মত্ত। একটানে তৃণার শার্টের সব ক'টা বোতাম ছিঁড়ে ফেলল। দক্ষিণের জানলার হাওয়ায় ওড়া পর্দার মতন শার্টটা খুলে তৃণার শরীরে উড়ছে। কালো ব্রাতে ঠাসা স্তনযুগল বে-আব্রু হয়ে উঠল। অনর্ঘ্যকে এ অবস্থায় আর সামলানোর জন্য তৃণাও কোনও সময় নষ্ট করল না। এক ঝটকায় তৃণা অনর্ঘ্যর ওপর বসে পড়ল। আজ সেও দেখতে চায় অনর্ঘ্যর ক্ষমতা। অনর্ঘ্যর হাত এগিয়ে চলেছে তৃণার বুকের দিকে। তৃণা দেখল অনর্ঘ্যর হাত কাঁপছে। অনর্ঘ্য চেঁচিয়ে উঠল, 'প্লিজ তৃণা, কাছে এসো।'

—কাছেই তো আছি।

—আরও কাছে। তাড়াতাড়ি।

মুহূর্তে দুটি শরীরের গোপন খেলা শুরু হল। কিছুক্ষণের মধ্যেই অনর্ঘ্য তার তুঙ্গ মুহূর্তে পৌঁছে গেল। তারপর শান্ত হল সে। কিন্তু তৃণা। তখনও সে অশান্ত। বিরক্ত হয়ে আস্তে আস্তে সে বলল, 'এ কী অনর্ঘ্য! আজ তোমার কি হল? আমার তো কিছুই হল না।'

তৃণার কথার মধ্যে একটা ভয়ঙ্কর শীতলতা ছিল। যা অনর্ঘ্যর পৌরুষে একটা জোর ধাক্কা দিল। অনর্ঘ্য কেমন জানি বেসামাল হয়ে পড়ল। তৃণাকে আদর করে জড়িয়ে ধরতে গেল। সজোরে তৃণা তাকে সরিয়ে দিল। অনর্ঘ্যর দিকে তাকিয়ে বলল, ' তুমি ইউজলেস।'

মুহূর্তে অনর্ঘ্যর মুখটা কেমন জানি করুণ হয়ে উঠল।

এদিকে ওরা আলচাতে মুখোমুখি বসে পড়েছে। বাঁশের কঞ্চির ঘর, উজ্জ্বল আলো, ছোট ছোট বেঞ্চি খুবই নান্দনিক। বাংলার এথনিক লুকের সঙ্গে একটা স্মার্টনেস জুড়ে শান্তিনিকেতনে একটা অন্য মাত্রা নিয়ে আসে এই আলচা। একটি ছেলে দু'টো গ্লাসে লাল চা দিয়ে গেল। নীল অভিষিক্তাকে বলছিল তার ভাস্কর হয়ে ওঠার কাহিনি। কেমনভাবে ছোটবেলায় সাগরের বালুচরে খেলাচ্ছলে বাড়ি বানাতে বানাতে নিজের মতন কিছু তৈরি করার ইচ্ছে তাকে আজ বিশ্বভারতী বিশ্ববিদ্যালয়ে নিয়ে এসে ফেলেছে। চায়ে চুমুক দিয়ে নীল বলল, 'আসলে মাঝপথেই আমার ইন্টারেস্টটা চেঞ্জ হয়। পেন্টিং থেকে স্কাল্পটিং-এ শিফট করি।' প্লেট থেকে স্ন্যাকস তুলে নিল নীল।

—আমার বায়োডেটার এখানেই ইতি.... নীল ভেবেছিল অভিষিক্তা কিছু বলবে। আসলে নীল জানতে চায়, অভিষিক্তা কে? কী করে ও? ওর কী পরিচয়? কিন্তু অভিষিক্তা চুপ করে থাকে। বাধ্য হয়ে নীলই প্রশ্ন করে।

—তুমি কী করো?

শার্টের সামনের দুটো বোতাম কখন খুলে গিয়েছে। সেখান থেকে বিপজ্জনক ভাবে তৃণার বুকের খাঁজ ফুটে উঠেছে। তৃণার চুল খোলা। ওর চোখ দুটো যেন অনর্ঘ্যকে কাছে ডাকছে।। হঠাৎ-ই তৃণার ওপর ঝাঁপিয়ে পড়ল অনর্ঘ্য।

—আমি কর্পোরেট সেক্টরে আছি। কর্পোরেটের সব সেক্টরই খুব বোরিং।

—তার মানে কি বোরডম কাটাতেই শান্তিনিকেতনে...

—তা বলতে পারো। তোমাদের লাইফটা খুব ইন্টারেস্টিং, না?

—কেন?

—না, এই ধরো তোমরা সব সময় ক্রিয়েটিভ ব্যাপার স্যাপারের সঙ্গে জড়িয়ে। তাছাড়া পরিবার থেকে এত দূরে এত দিনের একটা এক্সটেন্ডেড কলেজ লাইফ। এ সব বাদ দিলেও বসন্ত উৎসব, পৌষমেলা, শান্তিনিকেতনের জীবন যাপন এ সব তো আছেই।

নীল অভিষিক্তার কথা শুনে কী জানি ভাবল। তারপর বলল, 'কিছুটা ঠিক, আবার কিছু এরকম নয়। অনেক কিছু ভাবতে ভালো লাগে এই শান্তিনিকেতন নিয়ে। দূর থেকে যতটা সুন্দর, প্রশান্ত দেখায় আসলে কিন্তু বাস্তবে তা নয়।

—কেন? শান্তিনিকেতন নিয়ে কি তোমার মোহভঙ্গ হয়েছে?

—না। স্থান মাহাত্ম্য নিয়ে আমার কোনও সংশয় কোনওদিনই ছিল না। এখনও নেই। এটা ঠিক কথা সবাই এখানে খুব হইহুল্লোড় করে কাজ করি। তবে বসন্ত উৎসব এখন আর আগের মতো টানে না।

অভিষিক্তা অবাক হয়ে তাকাল নীলের দিকে। তার শরীরী ভাষায় স্পষ্টই বোঝা গেল সে বড় বিস্মিত হয়েছে। আসলে অভিষিক্তার সব কিছু ছেড়ে, একা শান্তিনিকেতনে ছুটে আসা তো বসন্ত উৎসবের জন্যই।

নীল অভিষিক্তার দিকে তাকিয়ে বলল, 'অবাক হচ্ছে তো? আসলে চোখের সামনে সব পাল্টে যেতে দেখলাম যে। দেখলাম কীভাবে একটা প্রাণের উৎসব আঁতলামির ঠেক হয়ে উঠল। আন্তরিকতা স্রেফ হাওয়া হয়ে স্ট্যাটাস সিম্বল হয়ে গেল। এই যে যারা প্রতি বসন্ত উৎসবে কলকাতা থেকে দামি বিশাল ঢাউস গাড়িতে দোলের ছুটিতে বন্ধুবান্ধব নিয়ে ছুটে আসেন, মদ আর রবীন্দ্রসঙ্গীতের ককটেলে কয়েকটা দিন কাটিয়ে যান—তারা বেশ করেন। ছুটি কাটান না। আমোদ-প্রমোদে বাধা কোথায়? কিন্তু খারাপ লাগে তখন, যখন তারাও প্রচার করতে থাকেন কতটা কালচারড্ তারা! এমনভাবে তারা সব কথা বলেন, যেন মনে হয় রবি ঠাকুর তাদের জন্যই...'

অভিষিক্তা বুঝল হঠাৎ-ই নীল একটু বেশি মাত্রায় উত্তেজিত হয়ে গিয়েছে।

—আর যারা প্রথম বার দেখছে?

—না। তাদের চোখে অবশ্য ফারাকটা ধরা পড়ার কথা নয়। ফার্স্ট এক্সপেরিয়েন্সের ব্যাপারটাই আলাদা।

হঠাৎ যেন নীলের মেজাজটাই পাল্টে গেল। হাসতে হাসতে বলল, 'তবে এবার মনে হচ্ছে বসন্ত উৎসবটা ভালো কাটবে।'

— কেন?

—এই প্রথমবার বসন্ত উৎসবে একজন সুন্দরী মহিলার গাইড হওয়ার সৌভাগ্য হল।

অভিষিক্তা মুচকি হাসল। একটু ভুরুটা কুঁচকিয়ে রসিকতার ছলে বলল, 'বাহ্! ফ্লার্টিং-এর কেতাটাও তো রপ্ত আছে দেখছি।

—বলছ? হ্যাঁ, সব কিছু শিখে রাখা ভালো।

—তা তোমার গার্লফ্রেন্ড জানে, সুন্দরী মহিলার গাইড হয়েছ?

—থাকলে তো জানবে।

অভিষিক্তা মাথা নেড়ে বুঝিয়ে দিল সে নীলের কথা বিশ্বাসই করছে না, 'ব্যাপারটা একটু বাড়াবাড়ি রকমের কাঁচা হয়ে গেল না? শান্তিনিকেতনী প্রেম, প্রেমের হল অফ ফেমে

কলকাতা থেকে দামি বিশাল ঢাউস গাড়িতে দোলের ছুটিতে বন্ধুবান্ধব নিয়ে ছুটে আসেন, মদ আর রবীন্দ্রসঙ্গীতের ককটেলে কয়েকটা দিন কাটিয়ে যান—তারা বেশ করেন। ছুটি কাটান না। আমোদ-প্রমোদে বাধা কোথায়?

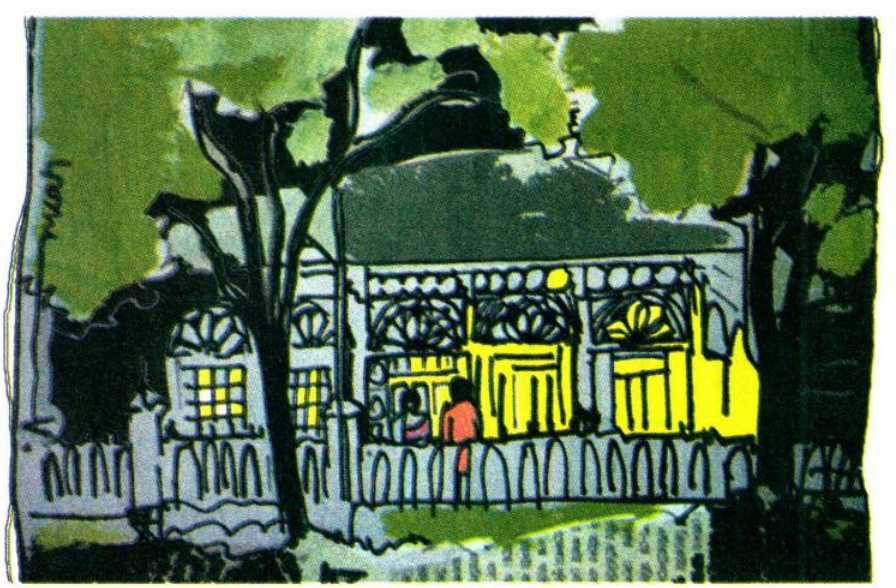

দু'জনেই হঠাৎ চুপ মেরে গেল। দূর থেকে ভেসে আসছে বিঠোভেনের নাইন্থ সিম্ফনি। রতনপল্লীর কোনও বাড়ি থেকে। এপাড়াতে অনেক নামজাদা রসিক লোক থাকেন। নীল কান খাড়া করে কিছুক্ষণ শুনল।

জায়গা করে নিয়েছে। তোমার মতো একজন সুপুরুষ ছ'বছর কাটিয়ে বলছে কোন স্টেডি রিলেশন নেই!'

—না সত্যিই কোনও স্টেডি রিলেশন নেই...

—আর আনস্টেডি?

—স্টেডি, আনস্টেডি কোনওটাই নেই। একটা সম্পর্ক গড়ে উঠছিল, তারপর মাঝপথেই সব আলগা হয়ে গেল। সে বিয়ে করে বিদেশেও চলে গিয়েছে। এখন আর যোগাযোগও নেই। এখন বলতে পার, আমি ফ্রি অ্যাজ আ বার্ড।

দু'জনেই হঠাৎ চুপ মেরে গেল। দূর থেকে ভেসে আসছে বিঠোভেনের নাইন্থ সিম্ফনি। রতনপল্লীর কোনও বাড়ি থেকে। এপাড়াতে অনেক নামজাদা রসিক লোক থাকেন। নীল কান খাড়া করে কিছুক্ষণ শুনল। তারপর অভিষিক্তার চোখের ওপর চোখ রেখে বলল, 'কী আশ্চর্য না! একটা মানুষ বধির হওয়ার পর এমন সাঙ্গীতিক ঝড় তুলতে পারে?'

সাঙ্গীতিক... বাহ্। আপনার বাংলাটা কিন্তু তারিফ করতে হয়। কে আপনি বিঠোভেনের কথা বলছেন?

—ওহ্ হো! আপনি তো খুব চালাক। আমার সব কথা পেট থেকে বার করে নিলেন। আর নিজেরটা কিছুই জানালেন না। বেশ তো 'তুমি'-তে নেমে আসা হয়েছিল। হঠাৎ আর 'আপনি' কেন?

—তাই তো। ঠিক আছে 'আপনি, তুমি রইল দূরে।' কী জানতে চাও বলো তো বাবা। ঝেড়ে কাশো।

—তোমার বয়ফ্রেন্ডও কি কর্পোরেট সেক্টরে?

—আমার তো অনেকগুলো বয়ফ্রেন্ড। কার কথা বলব বলো তো?

—এটা কি খুব পাকা হল?

অভিষিক্তা মুচকি হাসল, 'কী বলব বলো। সবার জীবনই তো এক রকম। আচ্ছা, আমরা তোমার বন্ধুর বাড়িতে যাব না?'

—তুমি বোর হচ্ছো না?

—একদমই না। এই সুন্দর পরিবেশে এক শিল্পীর সঙ্গে বসে কোন মহিলা কি বোর হতে পারে!

—তাহলে আরেক রাউন্ড চা হয়ে যাক।

—আমার আপত্তি নেই। কিন্তু আমাকে বোঝাতে হবে কেন তুমি পেইন্টিং থেকে স্কাল্পচারে চলে এলে।

চায়ের অর্ডার দিয়ে নীল অভিষিক্তার দিকে তাকাল। কালো চোখের মণি চঞ্চলা হরিণীর মতন স্বতঃস্ফূর্ত। তবে তাতে কোথায় এক টুকরো গহীনতা লেগে আছে। এমন ভালোবেসে নীলকে এমন প্রশ্ন কেউ কখনও করেনি। আজ বলবে নীল। দ্বিমাত্রিক থেকে ছোঁয়ার শিল্পরাজ্যে কেন সে প্রবেশ করেছে। ভালোবাসা আর প্যাশন থেকে জন্মান একজন শিল্পী, তারপর তার হৃদয়ে কত কাটাকুটির পর সে পথ খুঁজে পায়... যে পথ তাকে সন্ধান দেয় তার নিজের জগতের। যে জগতে আছেন তার সৃষ্টির ঈশ্বর, তার দার্শনিকতা। সব বলবে ও অভিষিক্তাকে। এখনই। এই আলচাতে।

নীল যখন তার প্রকাশ রীতি, পথ খোঁজার কাহিনি শোনাচ্ছে অভিষিক্তাকে তখন তৃণাকে ছেড়ে অনর্ঘ্য ধরছে ওদের হোটেলের পথ। তার অসমান পা ফেলা বুঝিয়ে দিচ্ছে মদের মাত্রাটা একটু বেশিই হয়েছে আজ। অনর্ঘ্যর বড় অস্বস্তি হচ্ছে। তৃণার কথাটা বার বার বুকে ধাক্কা দিচ্ছে। যে পৌরুষ নিয়ে অনর্ঘ্যর এত গোপন গর্ব তাতে আজ আঁচড় পড়েছে। তৃণাকে শারীরিক আনন্দ দিতে সে অক্ষম। মেনে নিতে পারছে না সে। হোটেলের পথে যেতে যেতে অনর্ঘ্যর মনে হল জীবনটাই অসহ্য হয়ে উঠছে। ❖ *চলবে*

অলঙ্করণ : অঙ্কন বন্দ্যোপাধ্যায়

কালীঘাটের মেয়ে পরিণীতা

ল্যাডলী মুখোপাধ্যায়

এই 'কালীঘাট' শব্দটির সঙ্গে যেন কয়েক কোটি ক্যালেন্ডারের পাতা আমার চোখের সামনে ঝরে পড়ল। আমি যেন ফিরে গেলাম সাতাশ-আঠাশ বছর পিছনে। সে এক অসাধারণ অভিজ্ঞতার উপান্তে। বস্তি সংগঠনের এক নেতা সেই সময় আমায় পটিয়ে ফেলেন যে সরাসরি মানুষের জন্য কিছু করতে হবে।

তখনও রাত বেশি হয়নি। দুর্গাপুর হাইওয়ে দিয়ে ফিরছি আমরা জনা চারেক। একটা ধাবা দেখে গাড়ি দাঁড় করালাম। এখানে বেশ ভিড়। তবে বাইরে খোলা আকাশের নীচে চেয়ার-টেবিল পেতে বেশ গুছিয়েই রেখেছে ধাবার মালিক। চারটে চায়ের অর্ডার দিয়ে আমরা গল্পগুজব করছি। আমাদের লাগোয়া টেবিলে এক দম্পতি বসে। সঙ্গে আট-দশ বছরের একটি কন্যা। সে এদিক-ওদিক ঘুরে বেড়াচ্ছে। এর মধ্যেই লক্ষ করি কন্যাটির মা বারবার আমার দিকে তাকাচ্ছে—যেন কিছু বলতে চায়। আমারও চোখটা ক্ষণে ক্ষণেই সেই মহিলার দিকে অজান্তে চলে যাচ্ছে। বলতে গেলে একটু অস্বস্তিই হচ্ছে। এই ভাবে চলে

কিছুকাল। তারপর ওই ভদ্রলোক যখন ধাবার ভিতরে ঢোকে, হয়তো কিছু নতুন অর্ডার করতে, তখন হঠাৎই এই মহিলা আমার কাছে এসে দাঁড়ায়। কিছু বোঝার আগেই পায়ে হাত দিয়ে প্রণাম করে বলে, 'স্যার ভালো আছেন?' আমি তো যাকে বলে হতভম্ব। কে এই মেয়ে, কীভাবেই বা আমি তার স্যার হলাম তা কোনও অনুমানেই বুঝতে পারছি না। কোনওভাবেই মেলাতে পারছি না। একবার মনে হল কোনও বিশ্ববিদ্যালয়ের ফিল্ম স্টাডিজের ছাত্রী ছিল কি না! তাও হতে পারে না। কেন না গত দশ বছর যে সব ছাত্র-ছাত্রীদের পড়িয়েছি তাদের প্রত্যেকের মুখ মনে আছে—যাদের প্রত্যেককে আমি নামে চিনি। এখনও অতটা স্মৃতিভ্রষ্ট হয়নি। তবে কে এই ছাত্রী?

এরপর আমার অবস্থা দেখেমেয়েটি বলে, 'চিনতে পারছেন না স্যার? আমার নাম নীতা। আপনি আমাকে পরিণীতা বলে ডাকতেন—কালীঘাট।' এই 'কালীঘাট' শব্দটির সঙ্গে যেন কয়েক কোটি ক্যালেন্ডারের পাতা আমার চোখের সামনে ঝরে পড়ল। আমি যেন ফিরে গেলাম সাতাশ-আঠাশ বছর পিছনে। সে এক অসাধারণ অভিজ্ঞতার উপান্তে। বস্তি সংগঠনের এক নেতা সেই সময় আমায় পটিয়ে ফেলেন যে সরাসরি মানুষের জন্য কিছু করতে হবে। এমন সব মানুষের জন্য এই কাজ করতে হবে, যারা সমাজে পিছিয়ে আছে। এবং শুধু তাই নয়, যাদের জন্য কাজ করারলোক নেই। তো কী সেই কাজ? ঠিক হল কালীঘাটের নিষিদ্ধ পল্লীতে যে শিশু-কিশোরেরা আছে তাদের পড়ানোর দায়িত্ব নিতে হবে। এদের মধ্যে কিছু ছেলেমেয়ে স্কুলে যায় বটে কিন্তু পড়াশুনায় মন নেই। এদের উৎসাহিত করতে হবে। আমার সেই বয়সে এমন ধরনের কাজে নিযুক্ত হওয়াকে বেশ গর্বের সঙ্গে গ্রহণ করলাম। সপ্তাহে দু'দিন পড়াতে হবে। ফলে তেমন কোনও চাপ নেই ভেবে শুরু করে দিলাম।

চাপ কি আর ছিল না? টালিনালার ধারে যাকে বলা হয় আদি গঙ্গা, তার দূষিত জলে, পচা গন্ধে জায়গাটা ম-ম করছে। একটা চালা ঘরের মাটির দাওয়ায় প্রাথমিকভাবে প্রায় জনা আটেক বাচ্চাকে নিয়ে আমার ক্লাস শুরু হল। চারদিকে মাছি ভন ভন করছে। দুর্গন্ধে প্রথম প্রথম বমি পেত। চারদিকের আবহ যাকে বলে মদোমাতাল আর কাঁচা খিস্তির বন্যায় রচিত হয়েছে। এখানে কেউ সোজা বা যাকে বলে সাধারণ ভাষায় কথা বলে না। সবাই উচ্চমার্গের খিস্তিসম্বলিত ভাষায়ই অভ্যস্ত। এমনকী বাচ্চাকাচ্চাদের সঙ্গে সেই একই ভাষায় কথা বলছে বড়রা। প্রথম দিকে মনে হত এ সব বন্ধ করতে হবে। মাথা গরম হয়ে যেত। কিন্তু ক্রমে অভ্যস্ত হয়ে যাই। সেই দাদা-নেতাটি আমায় বুঝিয়েছিলেন, 'আস্তে আস্তে। এখানে তাবৎ পরিবেশ পালটানো তোমার কাজ নয়। আর তা পারবেও না। আমরা যদি এই বাচ্চাগুলোকে একটু লেখাপড়া শেখাতে পারি তো জানবে বিরাট কাজ করা গেল।' কথাটার যৌক্তিকতা আমার মনে ধরেছিল। ফলে বছর খানেক টানা এই টালিনালার পাশে এই সব বাচ্চাকাচ্চাদের পড়িয়ে গেছি। আস্তে আস্তে কখন যেন এদেরই লোক হয়ে গেছি, এদের লোক না হয়েও। কোথায় পুলিশ ঝামেলা করছে, কোন খদ্দের

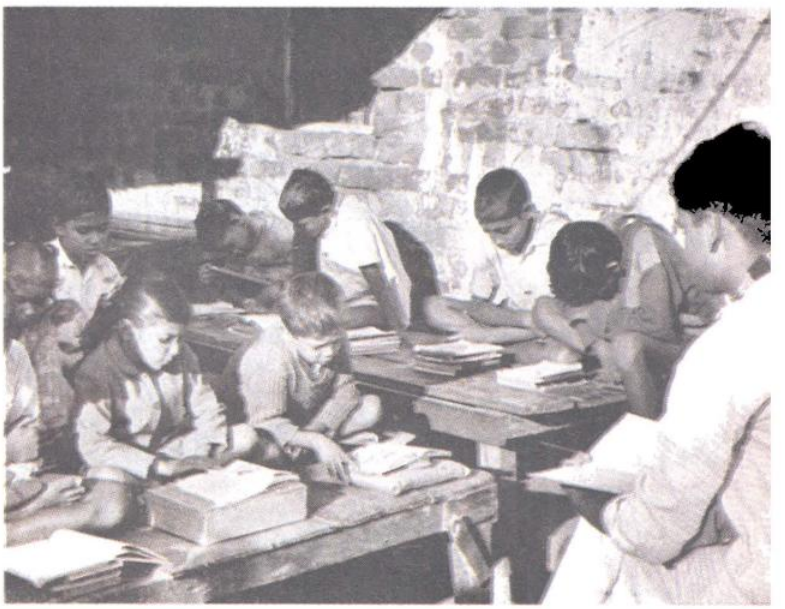

একটা চালা ঘরের মাটির দাওয়ায় প্রাথমিকভাবে প্রায় জনা আটেক বাচ্চাকে নিয়ে আমার ক্লাস শুরু হল। চারদিকে মাছি ভন ভন করছে। দুর্গন্ধে প্রথম প্রথম বমি পেত।

মদ খেয়ে এসে হুজ্জতি করছে, কার পালিয়ে যাওয়া বর এসে টাকার দাবি করছে তার গতর-খাটিয়ে বউয়ের কাছে, কে কাকে মারল-ধরল-সব কিছুর মধ্যে ধীরে ধীরে জড়িয়ে পড়তে থাকলাম। কিন্তু আমার মূল কাজ ছিল সপ্তাহে দু'দিন এই তথাকথিত বাপহারা ছেলেমেয়েদের পড়ানো। 'বাপহারা' কথাটা লিখলাম এই কারণে যে প্রায় প্রত্যেকটি ছেলেমেয়ে জানে না বা জানানো হয়নি যে কে তার বাবা, কী তার নাম। কখনও কখনও মায়েরা মিথ্যে নাম বুঝিয়ে দিয়েছে। কিন্তু সমস্যা হয়েছে যখন এরা স্কুলে ভর্তি হতে গেছে। আমাদের পুরুষতান্ত্রিক সমাজে সব সময়েই বাবার নামটাই প্রধানত গ্রাহ্য করা হয় ফলে তৈরি হয়েছে নানা জটিলতা।

এই ছেলেমেয়েদের পড়াশুনার মধ্যে ধরে রাখাই ছিল একটা বিরাট কষ্টকর কাজ। কেন না মায়ের খদ্দের এলে তার মদটা, সিগারেটটা, খাবার দাবার নিয়ে এলেই কাঁচা পয়সা পাওয়া যায়। আর এদের পড়াশুনা করার সময় ছিল সন্ধেবেলা।

এখানে এইসব শিশু-কিশোরদের পড়াতে গিয়ে নানা সমস্যার সম্মুখীন হয়েছি। বিশেষ করে স্কুলে ভর্তি করার সমস্যা। আজকে প্রচুর না হলেও অর্থাৎ কি না প্রয়োজনের চেয়ে কম থাকলেও বেশ কয়েকটি স্বেচ্ছাসেবী সংগঠন এইসব অঞ্চলে লাগাতার কাজ করে যাচ্ছে। সে সময় এই ধরনের কিছু সংগঠন থাকলেও তারা যে খুব একটা উচ্চকিত ছিল তা নয়। হয়তো সম্ভবও ছিল না। সে যাই হোক, এই ছেলেমেয়েদের পড়াশুনার মধ্যে ধরে রাখাই ছিল একটা বিরাট কষ্টকর কাজ। কেন না মায়ের খদ্দের এলে তার মদটা, সিগারেটটা, খাবার দাবার নিয়ে এলেই কাঁচা পয়সা পাওয়া যায়। আর এদের পড়াশুনা করার সময় ছিল সন্ধেবেলা। সে সময় তো এই অঞ্চল গমগম করছে। তখন কি আর পড়াশুনায় মন থাকে! এদের মধ্যে অনেকেই ছিল লেখাপড়ায় বেশ ভালো। চটপট বুঝতে পারত। কেউ কেউ একটু পিছিয়ে থাকা। তার কারণটাও সহজেই বুঝে ফেলি। যে অবহেলায় ও মানসিক নিপীড়নের মধ্যে এরা বড় হয়ে ওঠে তাতে এই ধরনের সমস্যা খুবই স্বাভাবিক। যেমন আগেই বলেছি যে একমাত্র মা-ই এদের ভরসা। তথাপি মা যে তার ছেলে কিংবা মেয়ের জন্য খুব একটা কিছু করতে পারে তা নয়। নিদেন দু'বেলা খাওয়াও অনেকের জোটে না। তারপর আছে রোগভোগ। এই সম্পর্কে আরও বিস্তারিত লেখা যাবে পরবর্তী কোনও কলামে। আপাতত ফিরে যাই সেই নীতার সঙ্গে দেখা হওয়ার প্রসঙ্গে।

'কালীঘাট' শব্দটি উচ্চারিত হওয়ার পর যথারীতি আমি নীতাকে চিনতে পারি। বলি, 'কেমন আছিস মা?' বেশ গর্বের সঙ্গে সে বলে, 'খুব ভালো আছি স্যার।' মেয়েকে দেখিয়ে বলে, 'এই আমার মেয়ে। আর উনি হলেন আমার স্বামী।' ইতিমধ্যে নীতার স্বামী ধাবার ভিতর থেকে বেরিয়ে আসে। নীতা বলে, 'ইনি সেই স্যার, আমাদের কালীঘাটে পড়াতেন।' বুঝলাম ছেলেটি আমার নাম পর্যন্ত জানে। এরপর নীতা চোখের ইশারায় আমাকে খানিকটা তফাতে ডাকে। আমিই শুরু করি, জিজ্ঞেস করি, হ্যাঁ রে, পড়াশুনা কতটা করতে পেরেছিলি?' নীতা এক গাল হেসে বলে, 'হাইসেকেন্ডারি অবধি। কিন্তু তারপর আর হল না। সংসার, মেয়ে সব সামলে আর পড়া হল না।' ক্রমে সে শুরু করল তার জীবনবৃত্তান্ত। এই ছেলেটি ছিল তার মায়ের নিয়মিত খদ্দের। বয়সে প্রায় পনেরো বছরের বড়। সে-ই নাকি তার মাকে বুঝিয়ে নীতাকে বিয়ে করে। পাইপের ব্যবসা করে। আজ তার ব্যবসা বেশ জমে উঠেছে বোঝা গেল সঙ্গের গাড়িটি দেখে। জিজ্ঞেস করলাম, 'তোর মার খবর কী?' নীতা ছলছলে চোখে বলে, 'কঠিন ব্যধিতে মারা গেছে। আর ক'টা দিন আগে মাকে নিজের কাছে নিয়ে রাখতে পারলে হয়তো বাঁচাতে পারতাম। মা শেষ বয়সে আমার কাছেই থাকত।' এ তো প্রায় হিন্দি ছবির মিলনান্তক কাহিনি। তা হোক, আমায় কেন জানি একটা মন ভরে ওঠা তৃপ্তির হাওয়া স্পর্শ করে গেল। ওরা পয়সা মিটিয়ে আমার কাছ থেকে বিদায় নিয়ে চলে গেল। আমি খানিকক্ষণ স্মৃতির মেঘের মধ্যে যেন ডুবে গেলাম। এই রকম আরও ছাত্র-ছাত্রীরা ছিল। তাদের কী হল? তাদের সঙ্গে কখনও কি কোথাও দেখা হয়ে যাবে? জানি না।

আজও তার অপেক্ষায়ই আছি। ❖

ছবি: লেখক

গাধা কখনও কম পড়িবে না

হরিদাস পাল

চুপিচুপি বলি, আমার স্ত্রী আমায় মাঝে মাঝেই আদর করে 'গাধা' বলে ডাকে। এই মধুর সম্ভাষণে আপনার মানসিক অবস্থা কী হত বলতে পারব না, তবে আমার কিন্তু মাইরি বলছি, বড্ড ভালো লাগে। এতটাই ভালো যে, মুহূর্তের মধ্যে আমার তৃতীয় নয়নের দৃষ্টি উদ্ভাসিত হয় আর দেখতে পাই আমি গাধা হয়ে গেছি। আমার পিঠে তিন বস্তা চাল, পাঁচ কেজি আলু, দু'কেজি পটল কিংবা ঝিঙে নিয়ে আমি আপন মনে ঘাস খেতে খেতে বাড়ির দিকে যাচ্ছি আর আমার স্ত্রীর চাবুক সপাং সপাং করে আমার পশ্চাদ্দেশে আদর করছে।

চাবুকের কথা যখন উঠলই তখন ভাই সত্যি কথাটা বলেই ফেলি। ক্রমশ বয়স বাড়ছে আর কবে নিজের কথা বলব? বলতে গিয়ে যদি হঠাৎ পটকে যাই তবে কাইন্ডলি থানায় একটা অস্বাভাবিক মৃত্যুর ডায়েরি করাবেন। দেখবেন, যেন আমার পোস্টমর্টেমটা ঠিকঠাক হয়। মৃত্যুর পর আর লজ্জা টজ্জা থাকে না। ডাক্তারবাবুরা নিশ্চয়ই আমার পশ্চাদ্দেশে টানাটানা চাবুকের দাগ দেখে সন্দেহ করবেন যে আমি দাগী আসামী, যার জীবনের প্রায় পুরোটাই কেটেছে গারদখানায়।

'গারদখানা' শব্দটা আমার ক্ষেত্রে প্রযোজ্য কি না তা আমার মা ঠাকরুণ শাশুড়ি বিমাতাকে জিজ্ঞেস করে নেবেন, একদিন লজ্জায় মাথা খেয়ে শাশুড়িকে বলেই ফেলেছিলাম আমার দুর্গতির কথা। তিনি উদাসীন গলায় বলেছিলেন, তখনই বলেছিলাম, নিয়ে যাচ্ছ যাও, ফেরত দিতে এসো না। আমি শাশুড়ির পদ যুগলে কপাল ঠুকতে ঠুকতে ঠক ঠক করে বলেছিলাম, মাগো, এবার তবে উপায়? তিনি বেশ ভেবেচিন্তে বললেন, আমার মামাতো ননদের ভাই মেটিয়াবুরুজ থানার ওসি, তাকে বলে দেব তোমাকে হাজতে পুরে দিতে। চাবুক খেতে হবে না। লপ্সি খাবে। আমি বললাম, কত দিন আর রাখবে? যদি বার করে দেয়? তিনি ভেবেচিন্তে একটা উপায় বার করে দিলেন। বললেন, গারদে সারাক্ষণ গাধার মতো ব্যা ব্যা করবে, ভুলে যাবে যে তুমি একসময় অনেকটা মানুষের মতো ছিলে। আমি বললাম, তারপর? তিনি বললেন, তারপর আর কী? জেলে না হোক পাগলা গারদে। তাও যদি না হয় তবে ময়দানে, কোথাও না কোথাও জায়গা হয়ে যাবে। তবুও সংশয় আমার কাটে না। আমি বললাম, খাব কি? তিনি অত্যন্ত তাচ্ছিল্যের সঙ্গে আমার দিকে প্রায় না তাকিয়েই বললেন, গাধাকে কি বিরিয়ানি খেতে দেখেছ? আমি বললাম, আজ্ঞে না, দেখিনি। তিনি বললেন, গাধা যা খাবে তাই খাবে। ঘাস। যার কপালে যা আছে। তবে একবার অভ্যাস হয়ে গেলে খারাপ লাগবে না। বরং নেশা ধরে যাবে।

অভ্যেসের প্রশ্নই যখন উঠল তখন এক জ্যোতিষীর দার্শনিক গল্পটা বরং বলেই ফেলি। এক ভাগ্যহত জ্যোতিষীর কাছে গেছে হাত দেখাতে, জ্যোতিষী হাত-টাত থেকে বেশ গম্ভীর গলায় বললেন, আপনার সামনের পাঁচ বছর খুব খারাপ যাবে। শুনে একদম মুষড়ে পড়লেন ভদ্রলোক। অনেকক্ষণ মুহ্যমান অবস্থায় থেকে একটু যেন আশার আলো দেখতে পেলেন। বললেন, গুরুদেব, তার পরের পাঁচ বছর? জ্যোতিষী চোখ বুজে ধ্যানস্থ গলায় বললেন পরের পাঁচ বছরটা খারাপ থাকা অভ্যেস হয়ে যাবে।

বাঁদর থেকে যে মানুষ এসেছে এই তত্ত্বটা আমাদের সবারই জানা। কিন্তু মানুষ থেকে রূপান্তরিত হয়ে কারা এই মর্ত্যলোকে এল তা কি আপনি জানেন? ভাবুন ভাবুন। সন্দেহ করুন। বার বার আয়নায় নিজের মুখটা দেখুন। ভালো করে লক্ষ করে দেখলে দেখবেন আপনার আর গাধার মধ্যে খুব একটা পার্থক্য নেই। তার মানে ভাববেন না, আপনাকে আমি 'গাধা' বললাম। তবে একটা ব্যাপারে আমি নিশ্চিত, জীবনে কি কেউ না কেউ রাগ করে বা অনুরাগে আপনাকে 'গাধা' বলে ডেকেছে? মানুষকে 'বাঘ' বা 'সিংহ' বলে ডাকলে গর্ব হয়, অথচ গাধা বলে ডাকলে কেন সম্মানে লাগে? 'খচ্চর'-ই বা খারাপ কী! এই সুযোগে বলে রাখি, আড়ালে কেউ কেউ আমায় 'খচ্চর' বলেও ডাকে। এমন কী 'তিলে খচ্চর'! আমার গায়ে পুলক লাগে। গর্বে আমার বুক ফুলে ওঠে। খচ্চর হওয়া চাড্ডিখানি কথা! বিশেষ করে এই গাধার রাজ্যে?

এই মুহূর্তে বড়ই আতঙ্কে আছি ভাই, ক'দিন আগেই খবরে প্রকাশ, কলকাতায় নাকি গাধা ক্রমশ কম পড়িতে পড়িতে একেবার অবলুপ্তির পথে। এ তো রীতিমতো অস্তিত্বের সঙ্কট! শুধু আমার নয়। আমার মতো অনেকেরই। আমরাও কি তবে উটপাখির মতো 'প্রায় পৌরাণিক বাল্যবন্ধু যত, বিগত সবাই, তুমি অসহায় একা...'

যত্তোসব ফালতু খবর। কলকাতায় গাধার আকাল! আমার মতো গাধা ভাইয়েরা গুজবে কান দেবেন না। কলকাতায় আর যাই হোক গাধা কখনও কম পড়িবে না। প্রমিস। ❖

অলঙ্করণ : সুদীপ্ত মণ্ডল

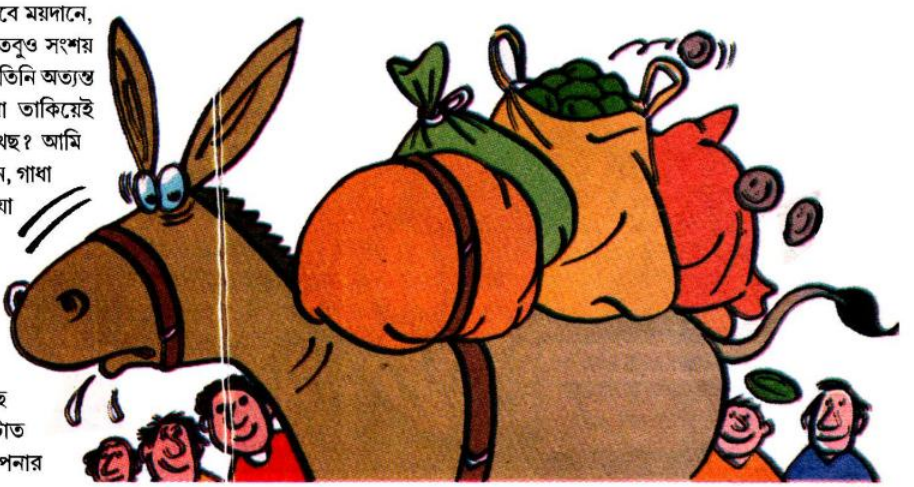

আরব্য রজনী
চিত্রনাট্য: শিবপ্রসাদ সাহু
অঙ্কন: সুদীপ্ত কোলে ও সুমন সরকার
পরের দিন চতুর্থ দরজা খুলতেই দেখি ঘরের মেঝের ঢালা কয়েকশো মুণিমুক্তো
এতো বড় মুক্তো কখনও দেখিনি আমি। এতো সম্পদ আমার গোটা সালতানিয়ৎ এ নেই। ওঃ! কি বিচিত্র সংগ্রহ!
সেই সর্বনাশা তামার দরজা! কিন্তু মেয়েগুলো আমাকে দিব্যি দিয়ে বারণ করে গেছে যে!
এইভাবে উনচল্লিশ দিন পার হয়ে গেল।
আজ অবধি একটি ছাড়া সবগুলো দরজা খুলে দেখেছি। মাত্র এই চাবিটাই বাকি আছে।
কী সুন্দর পরীর মতো মেয়েগুলো। কী রূপ আর কী উচ্ছল উদ্দাম যৌবন! তাদের ভুলতে পারব না।

যৌবনের পূর্ণ সুধাপাত্র আকণ্ঠ পান করিয়েছিল যে সব যৌবন মদেমত্তা পরম রমণীয় নারী-তাদের সেই করুন মিনতি!!
কিন্তু কৌতুহল এমনই বস্তু তার নিবৃত্তি না হলে সব তুচ্ছ মনে হয়।
এই সেই তামার দরজা! কী আছে এর পিছনে? এমন কী থাকতে পারে যার জন্য—
চাবিটা নিয়ে নাড়াচাড়া করি আর ভাবতে থাকি।
শয়তান যখন ভর করে তার আর নিস্তার নেই। তামার দরজাটা খুলেই ফেললাম!
কই কিছুই তো নেই? কেবল শূন্য ঘর!
হুম্‌ম্‌! একটা গন্ধ ভেসে আসছে শুধু। এ-একি!
আ-আ-আ!! আমার মাথাটা—

চলবে

Kalyan Kumar Mitra Education & Research Society

Knowledge partner:

COMPUTAX Consultants ™

KKMERS
Kalyan Kumar Mitra Education & Research Society

আমাদের অঙ্গীকার – সবার জন্য শিক্ষার সমান অধিকার

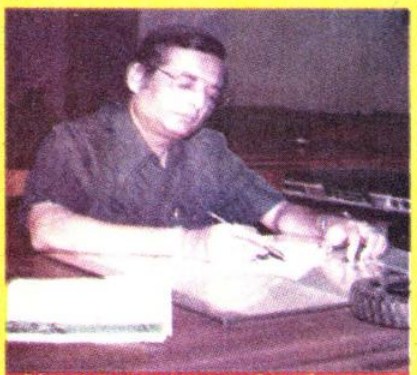

You gave yours today for our better tomorrow

Seminar on Motivational Talk for KMCP teachers organised jointly with KMC

IPA Scholarship Award for girl education

কল্যাণ কুমার মিত্র এডুকেশন অ্যান্ড রিসার্চ সোসাইটি

স্বর্গীয় কল্যাণ কুমার মিত্রের স্মরণে ২০১০ সালের মার্চ মাসে কল্যাণ কুমার মিত্র এডুকেশন অ্যান্ড রিসার্চ সোসাইটি স্থাপিত হয়।

- **কর্পোরেট সোসাল রেসপন্সিবিলিটি :**

আমাদের মূল উদ্দেশ্য হল অনগ্রসর ও দুস্থ শ্রেণীর শিক্ষালাভে সাহায্যের হাত বাড়ানো। এই সোসাইটি কর্পোরেট হাউসের সাহায্যে তাদের সি.এস.আর উদ্যোগ পরিকল্পনা নিয়ে থাকে, এবং এই লক্ষ্যে প্রয়াস সুজয় গ্রামীন বিকাশ প্রকল্প চালু করেছে।

- **অ্যাম্বুলেন্স প্রজেক্ট :**

বিদ্যালয়ের শিক্ষাবিদদের জন্য অ্যাম্বুলেন্স পরিষেবা চালু করেছে।

- **কম্প্যুটার দান :**

গরীব ও দুস্থদের কম্পিউটার প্রদান এবং বিনামূল্যে কম্পিউটার শিক্ষা দান।

- **কল্যাণ কুমার মিত্র স্মারক পুরস্কার :**

সেই সকল ছাত্রকদের জন্য যারা পড়াশোনায় উচ্চমানের ফল লাভ করেছে। এটি যৌথ ভাবে স্কটিশ চার্চ কলেজের প্রাক্তনীদের সহিত আয়োজিত করা হয়।

- **আইপিএ স্কলারশিপ পুরস্কার বালিকাদের জন্য :**

দুস্থ ও মেধাবী ছাত্রীদের আই.পি.এ স্কলারশিপ পুরস্কার প্রদান।

- **সেমিনার বা কনফারেন্স :**

সামাজিক সচেতনতা, শিক্ষার অধিকার, ও বিভিন্ন শিক্ষা সংক্রান্ত সেমিনার বা কনফারেন্স করা হয়।

- **কর্পোরেট সিটিজেনশিপ অ্যাওয়ার্ড :**

এর মুখ্য উদ্দেশ্য হল সেইসকল কর্পোরেট ব্যক্তিত্বদের স্বীকৃতি প্রদান করা যাঁরা কর্পোরেট দায়ীত্বের পরিভাষায় পথ দেখান এবং ব্যক্তিগত সমাজে তাঁরা সঠিক ও বিস্তারিত প্রতিবেদনের মাধ্যমে বৃহত্তর স্বচ্ছতা দেখান।

উপভোক্তা বিষয়ক মন্ত্রক (পঃ বঃ সরকার) দ্বারা নথীভুক্ত সংস্থা।

Every child's right to education

Kolkata Learning Project (facilitators with Kolkata Municipal Corporation)

IPA Scholarship for girl children

Kalyan Kumar Mitra Memorial Award for Academic Excellence 2012

KKMERS Award for Braving the ODDS

Launching of Souvenier at the 3rd Anaual Scholarship Programme 2012

শুভ নববর্ষ! ১৪২০

7/3 Mandeville Gardens, Gariahat, Kolkata - 700019
Email: kkmers.research@gmail.com, Web: www.kkmers.org
Ph: +91-33-24604536

IPA Scholarship for girl children
IPA Institute of Professional Accountants

Prosag Business Group
A CSR Initiative of Prosag Group

PSYCHOLOGICAL & COGNITIVE WELLNESS CENTRE

AddLife

Caring Minds

54A Sarat Bose Road, Kolkata-700025, Ph:9836403766

info@addlifecaringminds.com, www.addlifecaringminds.com

Visit us on

নূতন প্রাণ দাও, প্রাণসখা,
আজি সুপ্রভাতে
বিষাদ সব করো দূর নবীন আনন্দে
প্রাচীন রজনী নাশো নূতন উষালোকে

রবীন্দ্রনাথ ঠাকুর

শুভ নববর্ষ
১৪২০

আপনাদের সেবায় আমাদের ২৭১৬টিরও বেশি শাখার কর্মীবৃন্দ সদাব্রতী।
নতুন বছরের শুরুতে আমাদের শুভেচ্ছা গ্রহণ করুন।

প্রতি পদে
আপনার সাথে

১৮৬৫ সাল থেকে জাতির সেবায় নিয়োজিত

এলাহাবাদ ব্যাঙ্ক
বিশ্বাসের এক পরম্পরা

ALLAHABAD BANK
A tradition of trust

www.allahabadbank.in

naa/AB/2013